বিচিত্রা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

ভারতী-ভবন
১১, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট
কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা

ভারতী-ভবন

প্রকাশক : শ্রীত্রিষ্টুপ মুখোপাধ্যায়
১১, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ : ভাদ্র, ১৩৪৮
দাম : দেড় টাকা

লেখকের অন্যান্য বই

পর্ণজা (গদ্য কবিতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২৲)
উপলা (গদ্য কবিতা, ডি. এম. লাইব্রেরী ১৷৹)
খোয়াই (গদ্য কবিতা, মডার্ণ পাব্‌লিশিং সিণ্ডিকেট ১৲)
অন্তঃসলিলা (দীর্ঘ কবিতাবলী, বিশ্বভারতী ২৲)
শতপর্ণী (সনেট-শতক, বিশ্বভারতী ১৷৹)
জাপানী-ঝিনুক (অনুবাদ-কাব্য, বিশ্বভারতী ১৲)
ঝরা পালক (গল্পসংগ্রহ, বিশ্বভারতী ১।৹)
ব্রাউনিঙ-পঞ্চাশিকা (অনুবাদ কাব্য, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ২৲)
পোল্যাণ্ডের কবি-পরিচিতি (অনুবাদ কাব্য ও জীবনী,
মডার্ণ পাবলিশিং সিণ্ডিকেট ॥৹)
শেলী-সংগ্রহ (অনুবাদ-কাব্য, বিশ্বভারতী ১৷৹)
জোনাকি (সনেটিকা, বিশ্বভারতী ১৲)

মুদ্রাকর : শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ ৩২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীঅবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়, আই. সি. এস

প্রিয়বরেষু

মাঝে মাঝে আমার তরুণ বন্ধুদের পাল্লায় প'ড়ে সভায় দাঁড়িয়ে দু চারটে কথা লিখে নিয়ে গিয়ে পড়ে এসেছি। প্রবন্ধ রচনায় যাঁরা আমাকে হাতেখড়ি দিয়েছিলেন তাঁদের উদ্দেশে এই ভাষণগুলি একত্রে সঙ্কলিত হল এই আহরণীতে। নানা প্রসঙ্গে যে ভাব ও চিন্তাগুলি মনে জেগেছিল তারা একত্রে লিপিবদ্ধ রইল এই খস্‌ড়ায়।

বইখানি ছাপাবার হাঙ্গামায় স্বেচ্ছায় অংশ নিয়ে কবি আবুল হোসেন আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বেঁধেছেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
আধুনিক সাহিত্যের উৎসমূল … …	১
(সভাপতির অভিভাষণ, কোন্নগর পাঠচক্র, ৩।১০।১৯২৭)	
প্রগতিসাহিত্য … …	৮
(সভাপতির অভিভাষণ, শ্রীরামপুর প্রগতিসাহিত্য সংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন)	
কাব্যে অনুবাদ … …	১৯
(রবিবাসরের অধিবেশন, ২৫ শে ফাল্গুন, ১৩৪৭)	
সাহিত্যে শুচিতা … …	৩২
('মুসলিম সাহিত্যসমাজের' বার্ষিকী 'শিখা', ১৩৩৭)	
গতানুদর্শন … …	৪৭
('বঙ্গশ্রী', আশ্বিন, ১৩৪৫)	
বঙ্কিম প্রসঙ্গ … …	৫৭
(বাণীসংঘের বঙ্কিম শতবার্ষিকী, শ্রাবণ, ১৩৪৫)	
শ্রীপঞ্চমী … …	৬৩
(সভাপতির অভিভাষণ, চৈতালী সংঘ, ১৩৪৭)	
রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়' … …	৭২
('রবিবাসরের' অধিবেশন, প্রবাসী ১৩৪৬)	
শান্তিনিকেতনের স্মৃতি … …	৮১
(সভাপতির অভিভাষণ, বিশ্বভারতী সাহিত্যিকার সাধারণ অধিবেশন, ১৩৪৬)	

বিষয়			পৃষ্ঠা
শান্তিনিকেতনে	...	...	৯১
(শ্রাবণ, ১৩৪৭, 'ভারতবর্ষ')			
জন্মদিনে	...	...	১০৭
('রূপ ও রীতি', বৈশাখ ১৩৪৭)			
নজরুল ইস্‌লাম	...	...	১১৬
(নজরুল জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে, 'সওগাত', শ্রাবণ, ১৩৪৮)			
রবীন্দ্র জন্মোৎসবে	...	...	১২৩
('ভারতবর্ষ', ১৩৪৭, বাণীসংঘে পঠিত)			
শিবনাথ শাস্ত্রী	...	...	১২৯
(সভাপতির অভিভাষণ, ব্রাহ্মযুব সঙ্ঘ, প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৪৭)			
শরৎস্মৃতি	...	...	১৪৩
('রবিবাসরের' অধিবেশন, ১৬ই মাঘ ১৩৪৪)			
প্রমথ চৌধুরী	...	...	১৪৯
(প্রথম জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে 'রূপ ও রীতি'র জন্য লিখিত, ১৩৪৮)			

আধুনিক সাহিত্যের উৎসমূল

বর্ষার সময় যখন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি নামে তখন মাঠগুলো হয় জলাশয়, আর নর্দমাগুলি হয় তন্বী নদীধারার চুটকি সংস্করণ। কলকাতায় ঠন্ঠনে কালীতলা-অঞ্চলে মেঘ ডাকলেই আধহাঁটু জল দাঁড়ায়। এ-জল জমেও যেমন অচিরে, এর তিরোভাবও তেমনি দ্রুত। জলধারা বা জলাশয়কে স্থায়ী করতে হলে চাই হিমাচলের সঙ্গে নাড়ীর সম্বন্ধ, যার সমুচ্চ তুষারশৃঙ্গে অনবরত মশকে মশকে জল যোগাচ্ছে মেঘের ভিস্তি; অথবা চাই মাটি খুঁড়ে অন্তঃশীলার গুপ্তধারার সঙ্গে যোগস্থাপন। খরার দিনেও তা হ'লে নদী-পুকুর-কূয়োকে দেউলে হ'তে হবে না। পরের ধনে পোদ্দারি করা বেশী দিন চলে না। সে ভিক্ষাবৃত্তি বা চৌর্য-বৃত্তির মিয়াদ বেশী নয়। তা ধরা পড়ে অবিলম্বে এবং সিংহচর্মের আলখাল্লায় লম্ফমান বৃষভটির প্রকৃত পরিচয়

অরণ্যবাসী জীবদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় ধূর্ত শৃগাল।

আসল কথাটা এই, সত্য বস্তুটির উপলব্ধি অন্তরে, তার প্রকাশ সাহিত্যে। ফটোগ্রাফারের দোকানে ছবি তুলতে গেলে দামটা বেশী দিতে হয় নেগেটিভ বা খসড়া চিত্র-ফলকটির জন্যে, যার বুকে আছে ছায়ালোকের লিখাঙ্কন। তার পর সেটার নকল ছাপগুলি সহজ এবং সুলভ। ছবিওয়ালাকে গিয়ে যদি বলি, আমার মূল চিত্রলেখার প্রয়োজন নেই, তার নকল মুদ্রাঙ্কনগুলি দাও, তা হ'লে সে দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলবে ঃ রাস্তায় স'রে পড়, এখানে মিলবে না।

আজকালকার বাংলা সাহিত্যে যে জিনিষটা বড় বেশী চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে—ঐ আগে যা বলেছি—সেই অতি-বৃষ্টির বন্যা, অন্তরের জলসত্র নয়। অবশ্য, এর ব্যতিক্রম আছে বইকি, কিন্তু সেটা ক্বচিৎ লক্ষিত হয়। কিন্তু অত্যন্ত বিরল, অসাধারণ যা, তা আপনার স্বাতন্ত্র্য দিয়েই চল্‌তি নিয়মের আধিপত্য প্রমাণ করে। জানি, 'মৌক্তিকং ন গজে গজে'। কিন্তু ফুল ফোটে গাছে গাছে, যদি তার মূল শিকড়টি পায় সরস মাটির আশ্রয়। সাহিত্য রত্নখনিও বটে, মালঞ্চও বটে। রত্নপ্রসূর সংখ্যা সর্বত্রই বিরল, কিন্তু উপলব্ধ সত্যের আনন্দময় প্রকাশ প্রাণবান জাতির সাহিত্যে ত দুর্লভ নয়। গদ্যে পদ্যে উপন্যাসে নাটকে তার বিচিত্র নিদর্শন। আমাদের আধুনিক সাহিত্যে এই আন্তরিকতার অভাব লক্ষিত হয়।

এই প্রাণসম্পদকে অর্জন করতে হবে প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে নিবিড়তর যোগসাধনায়। তবেই সাহিত্য হবে প্রাণস্পন্দে বেপথুময়।

মৌলিক মানুষটি সব দেশেই এক। তার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন তাকে বিশিষ্ট রূপ দেয়, জীবনের আপাতলক্ষ্য ও গতিকে বিভিন্নমুখী করে। এ বৈচিত্র্য ও পার্থক্যের অন্ত নেই। আমাদের এই প্রাচ্যের কর্মশৈথিল্যের আবহাওয়া, সামাজিক সঙ্কীর্ণ বিধিনিষেধ, নষ্ট সংস্কৃতির ধ্বংসস্তূপের প্রাচীর, বহু যুগ ধরে আমাদের অনেকটা অচল-প্রতিষ্ঠ করে রেখেছিল। হঠাৎ এল সুদূর পশ্চিম থেকে একটা প্রবল শক্তির প্লাবন। ইংরেজের অধিকার যে কেবল আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে আবদ্ধ তা নয়, অন্তর্লোকেও পাশ্চাত্য প্রভাব আমাদের চিন্তা ভাব ও আকাঙ্ক্ষায় যুগান্তর এনেছে। আমাদের ভাবনা ও বাসনাকে যা অভিভূত করেছে, তার সঙ্গে আমাদের প্রতি-দিনের জীবনযাত্রাকে যদি খাপ খাইয়ে না নিতে পারি, তবে আমাদের প্রাণে হয় দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি। এ-বিক্ষোভ বা বিদ্রোহ যদি আমাদের অন্তরের আদর্শে সমাজ-সংসারকে গড়ে তোলবার জন্যে চেষ্টাবান করে, তবেই হয় জাতীয় জীবনে নবপ্রারম্ভের সূত্রপাত। আমাদের প্রাচীন ইতিহাস একটু আলোচনা করলেই দেখতে পাই, যুগে যুগে নানা বিধিনিষেধের ব্যবস্থা পূর্বাচার্যেরা করেছেন তাঁদের সমসাময়িক অবস্থার সঙ্গে সমাজের সামঞ্জস্যবিধানের জন্যে। প্রাণবান ব্যক্তি বা

জাতিমাত্রই আত্মরক্ষার জন্যে চারিদিকের অনুকূল-প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে একটা রফা ক'রে নেয়। এই আপোষে নিষ্পত্তি সহজ ও আয়ত্তাধীন হয় তখন, যখন বাহিরের বিঘ্নবাধার চেয়ে অন্তরের প্রতিবন্ধকতা তুলনায় কম প্রবল। কিন্তু যেখানে আমরা অন্তরের গুরুভারে নিপীড়িত, সেখানে বাহিরের সঙ্গে বোঝাপড়ার একটা প্রচেষ্টা আমাদের সামর্থ্যে আর কুলোয় না। এই সংগ্রামে ক্রমাগত হার মানতে মানতে হারাই জীবনের সত্যাশ্রয়। যেটা মন বলে ভাল, প্রতিদিনের আচারে আচরণে করি তাকে অস্বীকার। জীবনে আসে দ্বৈরাজ্য, কপটতা, ছদ্মাবরণ। উচ্চ আদর্শ না-থাকাও বরং শ্রেয়, যদি সে-আদর্শকে জীবনে সাফল্য দেবার সঙ্কল্প ও চেষ্টা, অন্ততঃ বেদনাটুকুও না জাগে। যে সর্ষে দিয়ে ভূত ছাড়ানো যাবে সেটাকেই ভূতগ্রস্ত করে তুলি। বাইবেলে একটা কথা আছে: If the salt loses its savour, wherewith the earth to be salted? লবণ যদি হারায় তাহার লবণত্ব, পৃথিবী কেমন করে পাবে লবণের আস্বাদন? সবই যে আলুনী ও স্বাদহীন হয়ে পড়বে!

যে সব চিরাচরিত সংস্কারের উপর বর্তমান যুগ আস্থাহীন হয়ে পড়েছে তাদের বর্জন ক'রে নূতন আদর্শে জীবনকে গড়ে তোলবার জন্য একটা প্রয়াস আজকালকার লেখায় অল্পাধিক পরিমাণে পরিস্ফুট। কিন্তু যে সত্যনিষ্ঠা অন্তরের আলোকে অজানা পথের অন্ধকারে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়,

সে অকুতোভয় প্রবর্তনা আমাদের পরমুখাপেক্ষী জীবনে এখনও তেমন জাগ্রত হয় নি। তাই রচনা যখন ভাজে উচ্ছে, বলে ভাজছি পটোল, কিংবা নিরঙ্কুশ ভাবালুতা অবাধে পায় প্রশ্রয়, যেহেতু কথার সঙ্গে অবশ্যকর্তব্যের দায়িত্ববোধ নেই। সত্যের উপর যাঁর অচল প্রতিষ্ঠা এবং সে সত্যকে, জীবনের দৈনিক আচারকে, শত বিরুদ্ধতা ও বিদ্রূপের মধ্যেও যিনি অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন, তিনিই সাহিত্যের ক্ষেত্রে অধিনায়ক। যাঁরা তাঁর নিন্দাবাদ করেন, তাঁরাও অন্তরে তাঁকে শ্রদ্ধা না ক'রে থাকতে পারেন না। সুপ্ত নারায়ণ ত সকলেরই মধ্যেই বিদ্যমান।

সাহিত্যে নবযুগ নবধারা আনতে হ'লে যত ক্ষুদ্র হোক, তবু একটি অনুকূল আত্মীয়গোষ্ঠীর প্রয়োজন, যাঁদের জীবনে কথার সঙ্গে কার্যের সামঞ্জস্য আছে। লেখকবর্গের রচনাবলীর আলোচনার জন্যে বাংলার গ্রামে গ্রামে মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হোক। সৎসাহিত্য হবে অরণ্যে রোদন মাত্র, যদি রসগ্রাহী পাঠকের অভাব হয় এবং দূষিত সাহিত্যের আক্রমণ থেকে সৎসাহিত্যকে রক্ষা করবার জন্যে শিষ্ট জনমতের অভ্যুদয় না হয়।

আমরা দুর্বল, তাই চরিত্রহীন হয়ে পড়েছি, অর্থাৎ অন্তরে যা সত্য বুঝি জীবনে তা অধিগত করবার জন্য সঙ্কল্প ও শক্তি আমাদের নেই। মর্মে মর্মে বুঝি যা অন্যায়, তার প্রতিবাদ করবার দায়িত্ববোধ বা বুকের পাটা নেই আমাদের। এ সম্পদ

যাঁদের আছে, তাঁরা নমস্য, আমার এ আলোচনা তাঁদের স্পর্শ করবে না। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই দেখি, আমাদের মেরুদণ্ডটি হয়ে গেছে রবারের, ভর সয় না। কলকাতার ঘরে ঘরে, বিজলীবাতি জ্বলে, পাখা ঘোরে। এই বিরাট বিপুল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপ্রতিষ্ঠানের সর্বত্র দেখি তড়িৎপ্রবাহকে ধরে রাখবার জন্যে চীনামাটি বা ঐরূপ কোন বিদ্যুৎস্রোতরোধক আগল দেওয়া থাকে। এই ছোট ছোট টুক্‌রাগুলির মধ্যে রয়েছে ধৃতিশক্তি। ওরাই বিপুল বৈদ্যুতিক তেজসম্ভারকে তারে তারে প্রবাহিত করবার আনুকূল্য দান করে। ওরা যদি ঘাঁটি আগলে না থাকত, তাহলে লক্ষ লক্ষ ডাইনামোতেও একটি বাতি জ্বলত না, একটি পাখাও ঘুরত না। এই বিধৃতি যাঁর আছে তিনি চরিত্রবান। জাতীয় চারিত্র্যের বনেদ যেখানে, সাহিত্যের অন্তঃশীলা উৎসারিত হয় সেখান থেকে।

বাঙালীর জীবনে যদি সত্যাশ্রয় আসে তবে সাহিত্যের শিবসুন্দর রূপটি স্বতই ফুটে উঠবে এবং আমাদের সমাজের সংসারে আনবে নবরবির অরুণরাগ।

বর্তমানের ভিতর অনন্তজন্মা চিরন্তন যে মূর্তিতে ভূমিষ্ঠ হয়, তাকে বলি আধুনিক। চিরপুরাতন এই রকম করেই তরুণ রূপ ধারণ করে। এ রূপ স্বতঃস্ফূর্ত, স্বয়ম্ভূ। কাল-সমুদ্রের মন্থন পুরাকালেই শেষ হয় নি। নিত্যকাল ধরেই চলেছে। সুধাভাণ্ড হাতে নিয়ে কাব্যলক্ষ্মী নানা দেশে নানা কালে সমুত্থিতা হন। উচ্চৈঃশ্রবা পক্ষ বিস্তার

ক'রে আকাশে উড্ডীন হয়। সেই সঙ্গে গরলও ওঠে। সে হলাহল পান করবার জন্য মহাদেব আবির্ভূত হন, সৃষ্টিরক্ষার্থ। এ আধুনিকত্ব প্রাণোচ্ছল জাতীয় যৌবন, 'তাজবেতাজবে নৌবে নৌ', এ চির নবীন, চির সুন্দর।

কষ্টকল্পনা ক'রে, প্রাণহীন কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়ে, দাঁড়কাককে ময়ূরপুচ্ছে শোভিত ক'রে, ঝুঁটি-ফোলা কাকাতুয়ার প্রগল্ভ কপ্‌চানিতে, পরবাণী-বিজৃম্ভিত গ্রামোফোনের কাংস্যনিনাদে টেনে আনবার নয়। এর জন্য চাই একাগ্র সাধনা, এবং সেই সাধনালব্ধ সিদ্ধি।

যে কোন একটা বিলেতী গ্রামার হাতে নিলেই দেখতে পাওয়া যাবে, আগে verb "to be"র conjugation, তার পর verb "to do"। পাঠশালায় "ভূ" ধাতুর রূপটি আগে আয়ত্ত করতে হয়েছিল, তার পরে "কৃ" ধাতুর সঙ্গে পরিচয়। আগে হ'তে হয়, করবার পালা আসে পরে। এই হওয়াই হচ্ছে একটা মস্ত বড় করা, জীবনের উদ্যোগ পর্ব। যে বলিষ্ঠ সুস্থ জীবনে অতীত ও পারিপার্শ্বিক নিগূঢ় রাসায়নিক যোগে একীভূত হয়েছে, চিন্তায় ভাবে কর্মোদ্যমে উদ্বেল হয়ে উঠেছে, সেই জীবনবেদ যে ঋক্‌মন্ত্রে উচ্চারিত হয়, তারই নাম আধুনিক সাহিত্য।

প্রগতি সাহিত্য

এই সেদিন শ্রীরামপুরে এসেছিলাম মাহেশের রথযাত্রার মেলা দেখতে। ভবিষ্যৎটা নাকের ডগাতেই হোক, আর দীর্ঘ দেশকালের ব্যবধানেই হোক, সমান অদৃশ্য। পিছু হেঁটে আমরা চলি ভবিষ্যতের পানে, চোখ দুটো নিবদ্ধ থাকে অপস্রিয়মান অতীতের উপর, সুতরাং পশ্চাতে অচির আগামীর কোনো আভাস চোখে পড়ে না। কে জানত দাতব্য চিকিৎসালয়ের ছাদ থেকে যে দৃশ্যটি সেদিন দেখেছিলাম, আজ সেই ক্ষেত্রে আমাকে মহড়া দিতে হবে? দেখেছিলাম, জগন্নাথের রথ জোয়ান লোকেরা টেনে চলেছে, আর রথের উপর কাঠের সারথি কাঠের ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আজকের এই সভার সভাপতিত্বের আসনে আপনাদের সাদর আহ্বান আমাকে সেই রথচালকের ভূমিকায় দাঁড় করিয়েছে। প্রগতি সাহিত্যের জোয়ানসঙ্ঘ রথের কাছি ধরে চলতি পথে বদ্ধ-পরিকর হয়ে অগ্রসর হয়েছেন। আনন্দের ভেঁপু বাজছে, উৎসবক্ষেত্রে উৎসুক দর্শকবৃন্দেরও অভাব নেই। অকেজোর পিঁজরেপোল থেকে দারু-ভূতো একটি বৃদ্ধকেও তাঁরা সংগ্রহ করে এনেছেন, এই উচ্চাসনে বসবার জন্যে। এ ক্ষেত্রে আমার যোগ্যতা-অযোগ্যতার প্রশ্নই আসে না, কারণ আমি সাক্ষী

গোপাল, চাপরাশ বার্দ্ধক্যমাত্র। যদি বলি, আমি জীর্ণতার প্রতীক, কোনো প্রবর্তনার প্রত্যাশা ত আমার কাছে নেই, তাহলে আপনারা বলবেন, 'তার প্রয়োজন নেই, আপনাকে ত টানতে হবে না, আপনি পুরানো পাঁজি, যা বাতিল হয়ে গেছে তার স্মারকলিপি। হিমালয়ের উপর থাকে স্তম্ভিত তুষার। সে তুষার গলে' হয় সহস্র ধারা, পায় অগ্রগতি। আপনাদের যুগ যেখানে হ'ল শেষ, সেই গঙ্গোত্তরীতে আমাদের যাত্রারম্ভ। বিগত শতাব্দী নৈয়ায়িকের গরুর মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গলঘণ্টা বাজিয়ে চলার ব্যঙ্গানুকৃতি করেছে মাত্র, চলেনি।'

গঙ্গার একটি নাম ভাগীরথী। কারণ ভগীরথ তাঁকে প্রবাহিত করেছিলেন সগরসন্তানদের পঞ্জরস্তূপে প্রাণসঞ্চার করবার জন্যে। জীবনের উৎস অতীতের হিমাদ্রিশিখর থেকে নামে। নবযুগ তাকে বরণ করে আনে বর্তমানের শ্মশান ক্ষেত্রে। আপনারা সাহিত্যের সঞ্জীবনী ধারা নব নব মুঞ্জরণের মুখে উদ্ভিন্ন করে তুলবেন বলে কৃতসঙ্কল্প। আপনাদের এই সাধু প্রচেষ্টা সার্থক হোক, এই আন্তরিক স্বস্তিবাচন ছাড়া আমার নিজস্ব বক্তব্য বিশেষ কিছু নেই।

একটা বাল্যস্মৃতি মনে এল। পঞ্চাশ বৎসরের আগেকার কথা। সে সময়ে কলকাতা শহরে প্রকাশ্যে ফাঁসী হত, দর্শকবৃন্দের ঝামেলা বিস্তর হত সেই বধ্যভূমিতে। তখন আমরা স্কুলে পড়ি। রাস্তা দিয়ে ছড়া কেটে বটতলার ফিরিওয়ালা ঘোষণা করতে করতে চলেছে ঃ

তিনকড়ি পালের ফাঁসী
দেখ গো শহরবাসী
......ইত্যাদি।

উক্ত তিনকড়ি পাল শহরের একটি ধনীর সন্তান। এক হতভাগিনী নারীর হত্যাপরাধে তার জীবনের যবনিকা পতন। ক্লাশের ছেলেরা কেউ কেউ তার ফাঁসী দেখতে গিয়েছিল। তাদের মুখে শুনলাম, তিনকড়ি গলরজ্জু হবার পূর্বে ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড়িয়ে যে প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা করেছিল তার সারমর্ম এই ঃ তোমরা আমার দৃষ্টান্ত দেখে সতর্ক হও। আত্মাপরাধ বৃক্ষের ফল গ্রহণ করবার জন্যে তোমাদের সামনে আজ দাঁড়িয়েছি। শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে হয়ত বা কাউকেও অনুতপ্ত হৃদয়ের সেই অন্তিম মর্মোক্তি উত্তরকালে আত্মবিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করতে সহায়তা করেছিল। আজ তরুণ সাহিত্য-সেবীদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে অপস্রিয়মান যুগের শেষ নিবেদনটি আমার মুখ দিয়ে আত্মনিবেদন করতে চায় শুধু এই বলে, আমাদের অক্ষমতা, ভ্রান্তি, সঙ্কীর্ণতা, অসত্য আপনাদের সতর্ক করুক, জাগ্রত করুক, নবতর প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করুক।

নদীর ধারা-পথটি মোহানা মাত্র। যে খাতের ভিতর দিয়ে কল কল করে জলস্রোত বয়ে চলেছে, সেটা শূন্যে বিলম্বিত নয়। তাকে বেষ্টন করেছে দুই কূলের তটবন্ধন, আশ্রয় দিয়েছে মাটি, তার বুকের উপর ঝুঁকে পড়েছে বায়ুস্তর, আকাশের রৌদ্রাতপ। সুতরাং তার এই পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনে সে

সেই রকম বাঁধা, আমাদের দেহের রক্তস্রোত যেমন বন্দী আমাদের নাড়ীতে, শিরা-উপশিরায়। নদীর প্রবাহে গ'লে পড়ে তটের ভাঙনমাটি, উদয়াস্তরাগ ঢালে স্বর্ণঝারি, দ্বিপ্রহর আনে কিরণবন্যা, নিশীথরাত্রের আলো-অন্ধকারে কখনো সে পায় জ্যোৎস্নাধারা, কখনো বা নক্ষত্রখচিত তমিস্রা। তেমনি আবার অকৃপণ তার বদান্যতা। কূলে কূলে সঞ্চারিত করে উর্বরতা, তৃষ্ণার্তের পিপাসা মিটায়, স্নানার্থীকে দেয় অবগাহন, পল্লী-লক্ষ্মীর শূন্যঘট ভরে, শহরের জলসত্রে জোগায় কলের জল, আকাশকে দান করে আপনার বাষ্পভার।

সাহিত্যের ধারাও এমনি করেই পায় মানবজীবনের সুখদুঃখপূর্ণ গলা মাটি, পাপপুণ্যের ছায়াঙ্কপাত, সুদূর ভবিষ্যের স্বপ্ন-আশা-আকাঙ্ক্ষার চলচ্চিত্র। তার দানও অসামান্য। অন্তঃশীলা হয়ে প্রবেশ করে জীবনের অন্তস্তলে, প্রাণের পরতে পরতে করে রসসঞ্চার, হৃদয় হতে হৃদয়ান্তরে জ্বালে দীপালী, এক দেশের ভাবসম্পদ নিয়ে যায় দেশান্তরে—গহনার নৌকায়।

জাতীয় নবজাগরণের অগ্রদূত প্রগতি সাহিত্য। যে পরিস্থিতির দানে তার পরিপুষ্টি, তাকে সে প্রাণবন্ত করে আত্মদানে। এই আদান প্রদান যদি বন্ধ হয়, নদী হয় মরাগাঙ, সাহিত্য হয় আঁস্তাকুড়।

ভাষা দেয় ভাবকে মূর্তি। ভাব দেয় প্রাণকে প্রবর্তনা, বিচিত্র কর্মপ্রচেষ্টায় সে প্রেরণা আমাদের জীবনের ক্ষেত্রে নানা অনুষ্ঠানে আত্মপ্রকাশ করে। সাহিত্যের প্রভাব আমাদের

জীবনে সর্বতোমুখী। বাইবেল গ্রন্থ বলেন: আদিতে ছিল বাক্য, সেই বাক্য জীবনের বীজমন্ত্র। আমাদের ঋষিরা বলেন ঃ সৃষ্টির পূর্বাহ্নে স্রষ্টা বসেছিলেন তপস্যায়—স তপোঽতপ্যত। উৎসর্জনের পূর্বে চাই অর্জন। যে নবযুগকে আপনারা উদ্বুদ্ধ করতে চান, কি মন্ত্রে তার উদ্বোধন হবে, সে সম্বন্ধে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে। মন্ত্র শব্দটি ব্যবহার করছি—আবেগবান বাক্য—এই অর্থে। শুধু মুখের কথা নয়, সে কথার পশ্চাতে আছে সাধনা, ব্যক্তিগত উপলব্ধি। গতিবিজ্ঞান যাকে বলে 'মোমেণ্টাম্', সেটা চলন্ত জড়পিণ্ড ও তার গতির গুণফল। কথা হল মৃত জড়, সেটা হয় মন্ত্র বা 'মোমেণ্টাম' যখন তাতে জাগে গতিবেগ। এই দিধাবিষা বা ছুটবার আগ্রহে, কথা হয় আকর্ণসন্ধানে আকৃষ্ট ধনুশ্ছিলার নির্মুক্ত তীর।

আমরা আজকালকার পৌস্তিক যুগে পরের কথা, পরের ধরতাই বুলি, দেশবিদেশের বার্তা এত অধিক গলাধঃকরণ করি যে, সেগুলিকে পরিপাক করবার অবসর বা সামর্থ্য আমাদের সে পরিমাণে থাকে না। পুষ্টিকর খাদ্য জীর্ণ করতে হলে চাই যথেষ্ট পরিমাণে ব্যায়াম বা দৈহিক পরিশ্রম। আমাদের জীবনে সেই বলিষ্ঠ কর্মপ্রচেষ্টা নেই, যার ইন্ধন জোগাবে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান। আমরা যে সবাই নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছি, এ কথাটা অত্যুক্তি ও অতথ্য। আমার বক্তব্য হচ্চে এই যে, অধিকাংশ স্থলে আমাদের কর্মের সঙ্গে অন্তরের

নিবিড় যোগ নেই। বাধ্য হয়ে দায়ে পড়ে দিনগত পাপক্ষয় করি। করিনা ত, আমাদের করায় অবস্থাচক্রে। ধরুন, ফুটবল ম্যাচ দেখছি এমন একটা চশমা নাকে এঁটে, যাতে কেবল ওই বলটাই চোখে পড়ে আর সব অদৃশ্য। মনে হবে বলটা কি লাফালাফিই করছে। কিন্তু তার প্রত্যেক গতিটির পিছনে আছে পদাঘাত, সেই ধাক্কাগুলো খেয়ে তার ছুটাছুটি। আমরা করি না, চলি না, বলি না, আমাদের করায়, চলায়, বলায়। আমাদের মগজের চেষ্টা কেন্দ্রটির (volitional centre) যেন ণিচ্ প্রত্যয় হয়েছে। তাই গতানুগতিকতা আমাদের মজ্জাগত। পরের বুলি কপ্‌চে সেই আত্মবাণী হারিয়েছি, যার উৎসমূল গভীরতম অনুভূতি ও অভিজ্ঞতায়, যার অভিব্যক্তি অতন্দ্রিত আনন্দময় কৃচ্ছ্র সাধনায়। তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁদের রচনায় সেই সত্যপ্রতিষ্ঠা আছে, প্রগতি সাহিত্যের মুক্তধারা তাঁদের লেখায় আপনার পথ কেটে চলেছে, দেখে প্রাণ উৎফুল্ল ও আশান্বিত হয়।

কিন্তু আমাদের বর্তমান অবস্থার সব চেয়ে বড় ট্রাজেডি বোধ হয় বুদ্ধিভ্রংশ। পন্থানির্ণয়ের দিকদর্শনযন্ত্র এবং বিচারের তুলাদণ্ড হারিয়েছি। দাবা খেলতে বসে যদি রাজা মন্ত্রী গজের মূল্য ভুলে যাই তবে খেলা হয় অচল অথবা যথেচ্ছাচার। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে আমাদের প্রাচীন সিদ্ধান্তগুলির অনেক ওলট-পালট হয়ে গেছে। সেই অনুপাতে জগৎ ও জীবনকে আমরা দেখতে আরম্ভ করেছি নূতন প্রেক্ষাভূমি

থেকে। যা ছিল বড় দেখাচ্ছে ছোট, যা ছিল ক্ষুদ্র দেখছি তার বিরাট মূর্তি। আমাদের পরিস্থিতিরও একটা বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। পশ্চিমের ভাব, চিন্তা ও এষণা বাঁধভাঙা বন্যার মত এনেছে একটা প্লাবন আমাদের অন্তর্লোকে। আমাদের চারিদিকে পল্লীর স্থানে যে সব শহর ক্রমশই মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, তাতে আমাদের দেশের মানচিত্রখানির আমূল পরিবর্তন প্রত্যহই লক্ষ্য করছি। পৌরাণিক যুগে পাহাড়গুলির ডানা ছিল। তারা যেখানে উড়ে গিয়ে বসত, সেখানকার দৃশ্যপট যেত বদলে। মনে করুন, যদি সেকালে ফটোগ্রাফি থাকত, আর আমাদের এই বাংলাদেশে এক ঝাঁক ছোট-বড় পাহাড় উড়ে এসে সমতল ক্ষেত্রগুলি জুড়ে বসত, তাহলে সেই ফটোগ্রাফের ছবি দেখে আমাদের এই শস্যশ্যামলা মাতৃভূমিকে কি চিনতে পারতাম? আজ আমাদের চিন্তারাজ্যে সেই সব পাহাড়ের প্রেতাত্মারা যেন পশ্চিম থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। আমরা আর 'বাংলার মাটি বাংলার জল' দিয়ে ঘেরা নই, আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে নানা দেশের নানা যুগের পার্বত্য চক্রবাল। সুতরাং 'নিজ বাসভূমে পরোবাসী'র নৈঃসঙ্গ্য, বিস্ময়, কৌতূহল, আশা ও আশঙ্কা আমাদের কতকটা বিহ্বল করে তুলেছে বই কি!

পশ্চিমকে আমরা যদি পেতাম আত্মপ্রতিষ্ঠার দৃঢ় ভূমির উপর, তাহলে আমাদের মধ্যে হঠাৎ বসন্তের আবির্ভাব হত। আমরা মুঞ্জরিত হতাম সেই বনস্পতির মত যার শিকড়গুলি

মাটির সরস বুকে অন্তর্গূঢ়, আর ডালপালায় লেগেছে দখিন হাওয়ার দোলা। কিন্তু বহুযুগের বল্মীকস্তূপে জীর্ণ হয়েছিল আমাদের প্রাণমূল, তাই আচমকা দমকা হাওয়ায় হলাম উন্মূলিত। আমাদের দশা হল সেই গাছের মত, যার মূল শিকড় পড়েছে কাটা, মাথায় বর্ষিত হচ্চে পর্জন্যদেবের আশী-র্ধারা। শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই অল্লাধিক ইঙ্গ-বঙ্গ। এটা খুব আনন্দ ও আশ্বাসের কথা হত যদি আমরা জাতীয় অভিজ্ঞা ও বহুদর্শনের উপর আস্থাহীন হয়ে না পড়তাম। অনেক স্থলেই তাই আমরা করেছি অনুকরণ, অনুশীলন নয়। আমাদের আচার-ব্যবহারে, সামাজিক রাষ্ট্রিক নব সংস্কারে পাশ্চাত্য রীতিনীতি নির্বিচারে নকল করবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছি, আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারিনি। ফলে যেটা দাঁড়িয়েছে, সেটা কৃত্রিম অন্তঃসারশূন্য।

আমাদের প্রত্যেকের ভিতরই সর্বজনীন একটি মানুষ বাস করে। দেশকালের খণ্ডতা, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া, চির-প্রচলিত সংস্কারের আড়ালে রয়েছে সেই অন্তর্গুহাবাসী বিশ্বমানব; দ্বন্দ্বময় এই যুগসন্ধির সময় দেশকে অগ্রগতি দিতে পারেন তাঁরা যাঁরা পূর্ব-পশ্চিমের একটা সমন্বয় সাধন করতে পেরেছেন, এবং জীবনের প্রয়োগক্ষেত্রে তার সমুচিত ব্যবহারে সক্ষম। এর জন্য চাই দেশের সঙ্গে নাড়ীর যোগ এবং এমন একটি মিত্রগোষ্ঠীর বৎসলভূমি, যেখানে অন্তরের আদর্শ অনুকূল আবেষ্টনের ভিতর আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

ঘড়ির সেকেণ্ড হ্যাণ্ডটা অত্যন্ত প্রগতিশীল, এক মিনিটে সে ষাট পা চলে, তার চাড়ে মিনিটের কাঁটা চলে এক পা। সে যখন হাঁটি হাঁটি পা পা করে ষাট পা এগোয়, তখন ঘণ্টার কাঁটার টনক নড়ে, সে এক পা সরে বসে। ঘড়িটা ঠিক চলে তখন যখন তার কাঁটাগুলির সঙ্গে বাঁধা চাকায় চাকায় দাঁতে দাঁতে মিল থাকে নতুবা সেকেণ্ড হ্যাণ্ডের তিন হাজার ছ'শ পা পদক্ষেপেও ঘণ্টার কাঁটা রইবে অচলপ্রতিষ্ঠ। আমাদের এই জাতিভেদ পীড়িত ও নারীর অবরোধাশ্রিত সমাজে সে ঘনিষ্ঠ অঙ্গাঙ্গী যোগ নেই যার কল্যাণে সমাজের স্তরে স্তরে নূতন আদর্শ, নূতন প্রবর্তনা ঊর্ধ হতে নিম্নে ধাপে ধাপে অবতরণ করতে পারে। ইউরোপে কুত্রাপি এ বিচ্ছেদ এমন দুরতিক্রমনীয় নয়।

শ্রদ্ধা ছাড়া মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ সম্ভবপর নয়। অবজ্ঞা দিয়ে আমরা আত্মীয়কে পর করি, ছোটকে বড় হতে দিই না, বড়কে হীন প্রতিপন্ন করবার জন্য শতমুখী হই। সৃষ্টি করি ঈর্ষা, বিদ্বেষ, বিচ্ছেদ। আমাদের বাঁচবার পথ এখনও পল্লীর আনাচে কানাচে লুকিয়ে আছে। আত্মরক্ষার জন্যে সেখানে আশ্রয় নিতে হলে বংশ ও পুস্তকের আভিজাত্যকে খর্ব করতে হবে। "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে"—এই কথাটির সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করবার সময় এসেছে। আর নেপোলিয়ানের সেই চিরস্মরণীয় উক্তিটি ঘরে ঘরে প্রচারিত করতে হবে: The hand that

rocks the cradle is the hand that rules the world. যে মাতৃহস্ত শিশুর দোলনা দোলায়, সেই হাতে আছে বিশ্বশাসনের সামর্থ্য। নারী শক্তিস্বরূপিণী। সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে কর্মক্ষেত্রে পুরুষের সহচরী, সহধর্মিণী। "কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষণীয়া চ যত্নতঃ", "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ"—এইসব উক্তি এই দেশেরই সনাতনী বাণী, অথচ এর ব্যতিক্রম ও ব্যভিচার কতখানি হয়ে এসেছে তা আপনারাই বলুন।

মানুষের কাছে মানুষের মত প্রিয় বোধ হয় আর কিছুই নেই। কথাসাহিত্যে, কবিতায়, জীবনচরিতে নরনারীর সুখদুঃখ অভাব আকাঙ্ক্ষা উপলব্ধির বিচিত্র আখ্যায়িকা আমরা উৎসুক কৌতূহলের সঙ্গেই পাঠ করি। এ যুগটা বর্তমান জগতের প্রচলিত সাহিত্যে বোধ করি বিশেষভাবে উপন্যাস নাটকের যুগ। বাঙলার প্রগতি সাহিত্যেরও এই দিকটাতেই ঝোঁক বেশী। বাজারে নভেল নাটক গল্পের চাহিদা সব চেয়ে অধিক। মাসিক, ত্রৈমাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিকে গল্পের ছড়াছড়ি। এই সব গল্পে বাঙলার সমাজের ও কল্পলোকের বিচিত্র-আলেখ্য ফুটে উঠেছে। কাশীতে বিশ্বনাথের মন্দিরে আরতির সময় সাধু অসাধু পণ্ডিত মূর্খ গুণ্ডা গাঁঠকাটা সব রকম যাত্রীরই ভিড় হয়। বাঙলায় সারস্বত মন্দিরে সৎ-সাহিত্যিকদের সঙ্গে দুর্বৃত্ত ও গুণ্ডার প্রাদুর্ভাবও যে হবে সেটা জানা কথা। বর্তমান যুগ ভাঙনের যুগ। ভূমিকম্প, রাষ্ট্র-

বিপ্লবের সময় দস্যুতস্করের উপদ্রবও অবশ্যম্ভাবী। ভাঙবার অধিকারী তিনিই, পুনর্গঠনের আদর্শ ও দায়িত্ববোধ যাঁর আছে। বাড়ীর দেউড়ীতে চোর বাট্‌পাড় তাড়াবার চৌকিদার থাকে। অন্ততঃ গৃহস্থের দরজায় খিল আছে। কিন্তু সাহিত্য বাতাসের মতই সর্বত্র অবাধগতি। অসূর্যম্পশ্যা অন্তঃপুরেও সে কুঞ্চকীর মত প্রবেশাধিকার পায়। বধূর বালিশের তল থেকে তরুণ ছাত্রের পাঠ্যপুস্তকের আড়ালে আশ্রয় লাভ করে। প্রগতিসাহিত্যসঙ্ঘের এ বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। মহাদেব গলায় গরল ধারণ করে হয়েছিলেন নীলকণ্ঠ। সে বিষ তাঁর পেটে তলায়নি, তলালে মৃত্যুঞ্জয় নামটি হারাতেন।

প্রগতিসাহিত্যসঙ্ঘ গণদৈত্যকে নয়, গণনারায়ণকে উদ্বুদ্ধ করুন, সাহিত্যের ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যাঁর একহস্তে পাঞ্চজন্য অপর হস্তে সুদর্শন চক্র।

কাব্যে অনুবাদ

ইংরেজিতে একটা চলতি কথা আছে :

Fools rush in where angels fear to tread.

দেবতা যেথায় পা ফেলিতে ভয় পায়,
মূর্খ সেথায় হুড়্মুড়িয়েই যায়।

তার চোখ আছে বটে. কিন্তু চক্ষুলজ্জা নেই। মোটা বুদ্ধির একটা সুবিধা এই, সূক্ষ্মবিচারের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা তাকে স্পর্শ করে না। অন্ধ আবেগেই সে চলে। যাত্রাটা শুভ কি অশুভ, নিরাপদ কি বিপদসঙ্কুল সে চেতনা থাকে না তার। একদা ব্রাউনিঙের গুটিকতক কবিতা তর্জমা করেছিলাম এই অন্ধ আবেগের বশবর্তী হ'য়ে। এটা অসম্-সাহস নয়, যাত্রাপথের বিঘ্নবাধা সম্বন্ধে অজ্ঞতা। অজ্ঞানের মত নির্ভীক কে?

কোনোদিন সাহিত্যিক ছিলাম না। তবে একটু আধটু বিলেতী কবিতা পড়তাম বটে। কে না পড়ে আজকালকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসাদে? তবে এক হিসাবে আমরা সকলেই কবি। আমাদের অল্পাধিক রসবোধ আছে এবং জীবনে অলব্ধির মধ্যে কাল্পনিক লব্ধির বা wish fulfil-ment-এর দিবাস্বপ্ন কিছুকিঞ্চিৎ সকলেই দেখে থাকি।

কবির প্রভাব আমাদের এই স্বপ্ন দৌর্বল্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে অন্ধ অনুভূতিটা মনে জাগে, অথবা মুখফুটে বলবার শক্তি নেই, সেই বোবার ভাষার আস্বাদ পাই তাঁর রচনায়। তিনি আমাদের মনের কথাটা শুধু যে টেনে বলেন তা নয়, এমন অনেক কিছু প্রকাশ পায় তাঁর রচনায়, যা হয়ত আমাদের অভিজ্ঞতা বা চিন্তার এলাকার ভিতর পাইনি, তবু তার অনির্বচনীয় মাধুর্যে রূপকথার মতই আমাদের অপগণ্ড চিত্তকে অভিভূত করে। আমাদের জ্ঞান ও প্রেমের অপূর্ণতার মধ্যেই ত অকালশিশুত্ব অন্তর্গূঢ় হয়ে থাকে। সংসারের পোড়খাওয়া বিষয়বুদ্ধি আমাদের কিলিয়ে কাঁঠালপাকা করলেও, নিতান্ত দর্‌কচাপড়া মন যার নয়, তার মধ্যেও আনাচে কানাচে একটু নবীনতা সরসতা লুকিয়ে থাকে। যার যেখানে একটু ব্যথার সাড় আছে, কবির দরদি স্পর্শটি ঠিক পড়ে সেইখানটিতে। অমনি আমরা শিউরে উঠি। তাই সর্বদেশে সর্বকালে কবিকে আমরা চিনি আত্মিক অনুভূতির কল্যাণে ও অভিনব স্বপ্ন কল্পনার উদ্দীপনায়।

প্রত্যেক মানুষ তার পরিবৃতি, পূর্বসংস্কার ও আত্মস্থজনের সমষ্টি। ভাষার ব্যবধানের চেয়েও এই মৌল পদার্থ অনেক বেশী। কিন্তু উভয়কে অতিক্রম ক'রে একটা সার্বভৌমিক মানবতা আছে যেখানে আমরা সকলেই বিশ্বমানবীয়। পাশ্চাত্য কবিদের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা হয় এই দেশকালাতীত মানবাত্মিক লোকে। ইংরেজি ভাষা ব্যবহারিক হিসাবে

আমাদের কতকটা আয়ত্ত হ'লেও তার পরিস্থিতির আসল রূপটি আমাদের অনেকটা অগোচরেই থাকে। তবু যেটুকু আভাস পাই, চিন্তা ও ভাব রাজ্যে তার মূল্য ও প্রভাব অপরিসীম।

আর্থিক জগতের সঙ্গে আমাদের দেনাপাওনা চলে দেশী টাকা পয়সাকে বিদেশী মুদ্রার নিরিখে বেঁধে দিয়ে। এ বাজার দরের উঠ্‌তি পড়্‌তি আছে। তবু লেন-দেনের একটা পাকা ব্যবস্থা সচল ভিত্তির উপর অচল প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। নতুবা চঞ্চলা লক্ষ্মী বাণিজ্যে তাঁর অটল আসনখানি পাততে পারতেন না। আমাদের অন্তর্লোকের বাণিজ্য চলে ভাষার রূপান্তরিত অনুবাদের ভিতর দিয়ে। ইতিহাস, বিজ্ঞান তথ্যাদির পরিচয় এই তর্জমার সাহায্যে ভালই চলে। জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি অবিকৃত ভাবেই দেশদেশান্তরে প্রচারিত হতে পারে এই অনুবাদের আনুকূল্যে। কিন্তু কাব্যের অনুবাদে এ সাধারণ নিয়ম খাটে না। কারণ কাব্য কেবল তথ্য ও তত্ত্বাত্মক নয়, রসস্বরূপ ও তৃপ্তিহেতু। মূল কবির ভাব ও চিন্তা কী, এইটুকু বলতে পারলেই তার সব বলা হল না। সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে যাকে প্রসাদগুণ বলে, সেটাই হচ্ছে কাব্যের প্রাণ। এই স্বতঃস্ফূর্ত দীপ্তি ফুটোতে হবে অনূদিত ভাষার আঙ্গিক ও আত্মিক ব্যঞ্জনায়। এই জন্যে কবিতার অনুবাদে মূল ভাবটি বজায় রেখে তাকে নব জন্মান্তরে উত্তীর্ণ করাতে হবে নব দেহে। বহিরাকৃতির সঙ্গে ক্বচিৎ হয়ত প্রাক্তন ছন্দযতির সাদৃশ্য

থাকতে পারে, কিন্তু সেটা গৌণ। ছন্দের তাল মান লয় বেঁধে দেয় কথার হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণ ও দ্রুত বিলম্বিত গতির ঝঙ্কার। স্বদেশী ও বিদেশী কথার মধ্যে যেখানে কোনো জ্ঞাতিত্বই নেই, সেখানে বিদেশী ছন্দানুবর্তী দেশী বাক্যগুলি ভাবের গণ্ডগোল উৎপন্ন করবে। পায়ের মাপে জুতো না হয়ে যদি জুতোর মাপে পা ছাট্‌তে হয় তবে পদরাজ্যে আপদেরই সৃষ্টি হবে। আসল লক্ষ্যের বিষয় মূল কবিতার ঠিক অন্তর্নিহিত ভাব। নবরূপায়ণে তার আকৃতি ও সৌষ্ঠব গঠিত হ'বে নব উপাদানের সমীকরণে। এক কথায়, অনূদিত কবিতাটি হবে রূপ ও রীতি হিসাবে সম্পূর্ণ নূতন কবিতা। তার অন্তর্গুহাবাসী জীবাত্মাটি হবে মূল কবিতার প্রেতাত্মা।

প্রাণ বলে 'ইহ বাহ্য আগে কহ আর।'

আরো গোড়ার কথা হচ্ছে এই, মূল কবিতা কিম্বা তার অনুধ্বনি 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল' কি না। বিলেতে এক মেলায় লক্ষ্যভেদের খেলা দেখেছিলাম। বন্দুকের গুলিটা Bull's Eye বা শরব্য বিন্দুটি ভেদ করলেই অমনি পিছনে একটা ঘণ্টা বেজে উঠত। যে কবিতা পাঠ করা মাত্রই অন্তস্তলে গিয়ে পৌঁছয়, প্রাণে অমনি স্বতঃস্ফূর্ত প্রশস্তি জাগে, তার এই আনন্দস্যজনী উদ্দীপনাই তার শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ। মনের কষ্টিপাথরে খাঁটি সোনার রেখায় সে আপনার স্বাক্ষরটি লিখে দেয়।

এক স্তর কাগজ আঠা দিয়ে জুড়ে তার উপর অতসীকাচে

কেন্দ্রীভূত রবিরশ্মি যদি ফেলা যায়, তবে দেখতে পাই সেই খরদীপ্ত আলোক বিন্দুটি কখনো পাঁচ ছ' খানি কাগজ পুড়িয়ে ফুটো করে, কখনও বা প্রথম স্তরেই তার উত্তাপ ফুরিয়ে যায়। এই তারতম্য নির্ভর করে মেঘনির্মুক্ত বা মেঘ্লা আকাশের ঔজ্জ্বল্যের উপর। এই penetrating power বা অন্তর্ভেদী শক্তিই বোধকরি উৎকৃষ্ট কবিতার একটি বিশেষ লক্ষণ। কোনো কবিতা মর্মান্তে পৌঁছয়, কোনোটি খানিকটা প্রবেশ লাভ করে, কোনোটি বা ভিতরে ঢুকতেই পারে না।

মূল কবিতার মর্মস্পর্শিতা অনেকটা পরিমাণে নির্ভর করে তার ছন্দে, বাঙ্‌মাধুর্যে ও association বা সঙ্গোপাঙ্গিক বিচিত্র ইঙ্গিতের দ্যোতনায়। এই অনুসাঙ্গিক ব্যঞ্জনায় কবি বাক্যের সহিত অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করেন। যে কবিতাটি পড়বামাত্র চিত্তকে বিদ্ধ করে, তার সেই মর্মভেদিতার অনুপাতেই মূল্য নিরূপিত হয় আমাদের অন্তরে। অনুবাদ বা মূল কবিতার যাচাই করি এই মনোহারিত্বের গুণে। মূল কবিতা প'ড়ে যে আনন্দলাভ করা গেল তার অনুবাদে যদি সেইরূপ একটা হর্ষানুভূতি জাগে তবে বলব অনুবাদ সার্থক হয়েছে। নতুবা সেটা ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে মাত্র, রসঋদ্ধি লাভ করেনি। সুতরাং কাব্যহিসাবে নগণ্য।

শ্রেষ্ঠ কবিতা দুর্লভ রত্নের মতই অপ্রতুল। যে কোনো বড় কবির লেখা গড়ের উপর সাধারণ শ্রেণীর কবিদের রচনার

উর্ধে থাকলেও, সে গিরিরাজির মধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘা ধবলগিরির সংখ্যা খুব বেশী নয়। যথার্থ কাব্যরসিকদের ভোট সংগ্রহ করলে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হবে ক'টি? প্রশ্ন এই, এগুলির অনুবাদ উচ্চাঙ্গের হ'তে পারে কি না? উত্তরে বলি, হাঁ—'উৎপৎস্যতে যদি কো পি সমানধর্মা', সমকক্ষ অনুবাদক যদি জোটে। যে কবিতা অনুপ্রাণনা এনেছে, ফলাফলের দিকে দৃকপাত না ক'রে ঐকান্তিক আগ্রহের সঙ্গে সেটি তর্জমা করবার চেষ্টায় অনুবাদক কৃতার্থ হবেন। কৃতিত্ব কতটা অর্জন করলেন বা না করলেন, তার বিচার মরমী পাঠকের হাতে।

ইয়োরোপে কোনো ভাল বই প্রকাশিত হলেই অমনি সেটা নানা প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদিত হয়ে যায়। শুনেছি রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' আঠারোটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে ওই মহাদেশে।

আমাদের দেশে অনুবাদ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবার উদার ক্ষেত্র পড়ে আছে। এই ক্ষেত্রে অগ্রণী কবি সত্যেন্দ্রনাথ 'তীর্থ সলিল' সংগ্রহ করে আমাদের চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। 'রবিবাসর' সাহিত্যসেবকদের মণ্ডলী। তাঁরা স্বতঃ পরতঃ এ বিষয়ে যত্নবান হলে বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ অভাব দূর হ'তে পারে। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবিরা অনেকেই কিছু না কিছু কাব্যানুবাদ ক'রে মাতৃভাষার সম্পদ বাড়িয়েছেন।

আজ পৃথিবী জুড়ে ভাঙনের মড়মড়ানি জেগেছে। এ সময়ে কাব্যচর্চা করাটা কেউ কেউ বরদস্ত করতে পারেন না। তাঁরা

ভাবেন কাব্যের মধ্যে আছে কেবল ভাববিলাস। অন্নসমস্যা-ক্লিষ্ট এই দেশে, বহ্নিমান রোমের সামনে নীরোর বেহালা বাজানোর মতই নির্মম। অকর্মণ্যতার গ্লানির মধ্যে এরূপ মনোভাব অস্বাভাবিক নয়। আমাদের সকলের প্রাণেই কবির গানের ঝঙ্কার বাজে :

> "থাক বীণা বেণু মালতী মালিকা,
> পূর্ণিমা নিশি মায়া কুহেলিকা,
> এসো সংগ্রাম, এসো মহাজয়,
> এসো গো মরণ সাধন।"

কিন্তু একথাও ঠিক, কবির বাণী চিত্তকে যেমন উদ্বুদ্ধ করে তেমন ত আর কিছুতে করে না। ব্যক্তিগত জীবনের বিঘ্ন বিপত্তি অক্ষমতার সঙ্গে সংগ্রাম করবার জন্যে আনে উদ্দীপনা। ইংরেজি তর্জমার ভিতর দিয়ে যখন জাপানী কবির অগ্নিময়ী বাণী শুনি :

> রাখো বীণা বেণু পুঁথি পাত্তাড়ি তোল,
> অবসরভরা রুদ্ধ দুয়ার খোলো,
> লহ তরবারি, ভল্ল ভিন্দিপাল,
> অধ্যয়নের গানের ফুরালো কাল।
>
> পত্নী প্রেয়সী ওই দেখ ঘরে ঘরে
> খুলি কেশপাশ সুখে বিক্রয় করে
> বসন ভূষণ যত আছে নিঃশেষে
> পতিপুত্রেরে সাজাতে যোদ্ধৃবেশে।

কৃপণের মত গণনা করিছে কেবা
দানের বহর? মাতৃভূমির সেবা
করিব জীবন মরণের পণ করি,
রাজা ও রাজ্য রক্ষিব অসি ধরি।

তখন কি কবিকে বলা চলেঃ থাক্ তোমার কবিতা। চর্‌কা নাও, সুতো কাটো!

মানুষমাত্রেই চরকা কাটে। সে কর্মসূত্রে কেউ বোনে খদ্দর, কেউ বনমালীর পীতাম্বর, কেউ ম্যাজিক্ কার্পেট, কেউ বা পাকায় তার উদ্বন্ধনের গলরজ্জু। কবির স্থান আমাদের অন্তরে। তাঁর বাণী হয় অমৃতময় যদি তার পশ্চাতে থাকে সত্যানুভূতির প্রাণস্পন্দন। যে দেশ মরণাপন্ন, তার জীবন সঞ্চারের জন্যেই ত চাই কাব্যের মৃতসঞ্জীবনী ধারা।

কিছুদিন পূর্বে পোল্যাণ্ডের গুটিকতক কবিতার ইংরেজি তর্জমা আমার হাতে পড়েছিল। মনে আছে সেই পুস্তিকার ভূমিকায় পড়েছিলাম, পোল্যাণ্ডের সৃজনী প্রতিভার শ্রেষ্ঠ ফসল ফলেছিল সেই শতাব্দীতে, যে শতকে ইয়োরোপের মানচিত্র থেকে তার নাম পর্যন্ত মুছে ফেলা হয়েছিল। উনবিংশ খ্রীষ্টাব্দ পোল্যাণ্ডের রাজনৈতিক আত্মবিসর্জনের যুগ। এই যুগেই কিন্তু তার শ্রেষ্ঠ কবি বৈজ্ঞানিক সুরস্রষ্টা ও চিত্রশিল্পীর অভ্যুত্থান। এইখানে পোলিয় কবি জিগ্‌মণ্ট ক্র্যাসিন্‌স্কির 'প্রতীক্ষা' শীর্ষক একটি কবিতার বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করবার প্রলোভন সম্বরণ করতে পারলাম না।

বসে আছি প্রতীক্ষায়, মুক্তিপথে কবে মোর স্বদেশী সেনানী
লভিবে অবাধগতি, দাসত্বের অবসান হবে চিরতরে।
সমুৎসুক আঁখি পরে নবরবি সুপ্রভাত কবে দিবে আনি,
পূর্বাশার পানে তাই চেয়ে আছি, অশ্রুজল আঁখি অন্ধ করে।

গৌরবমণ্ডিত সেই শুভদিন আসে ধীরে মন্থর চরণে,
আজি বর্তমানে হায় স্বদেশের শব দেহে হেরি কৃমিকীট,
দেবমন্দিরের চূড়া পড়ে ভাঙি' দুরাত্মার বজ্র প্রহরণে।
কবে নেহারিব নব সবিতারে! আঁখি জলে ঘনায় প্রাবৃট।

অফুরান বর্ষাবলি ভেসে আসে ভেসে যায় কালের প্রবাহে,
আশা মায়ামরীচিকা, মরুবক্ষে প্রসারিত চিত্রলেখা তার,
ক্ষতি ত্যাগ সহি নিত্য, সাফল্যের আশা কভু ফলিবে পুণ্যাহে
নবীন অরুণরাগে? নয়নে ঘনায় আঁধি অশ্রুবরষার।

ব্যর্থ স্বদেশানুরাগ, কালকূট করি পান হিংসার ভৃঙ্গারে,
আলোকবুভুক্ষু চক্ষে জাগে শুধু অন্ধকার জাগর নিশীথে,
পরাধীন শুধু মোরা, আর সবে ঋদ্ধিমান পূর্ণ স্বাধিকারে
জাগি নবভানু লাগি', হারাই চোখের দৃষ্টি কাঁদিতে কাঁদিতে।

বিদেশী কবিতার তর্জমায় শুধু যে আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধিশালী হবে তা নয়। এই প্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে বাংলাভাষা অভিনব শক্তি ও পরিপুষ্টি লাভ করবে। আমরা যেমন বেশী কথা বলি, জাপানী বা চীনারা তেমনি স্বল্পভাষী। জাপানী 'হক্কু' কিম্বা তজ্জাতীয় বালখিল্য কবিতাগুলি নিতান্ত বাক্যবিরল। তিন লাইন ও পাঁচ লাইনের কবিতা সতেরো ও

পঁয়ত্রিশ syllable বা শব্দাংশে রচিত। মূল জাপানী কবিতা ত আমার চোখে হিজিবিজি মাত্র। কিন্তু ইংরেজি অনুবাদের দু চারটি লাইন পড়লে প্রাণে মৌতাত লাগে।

আমি যাত্রী প্রেমপথে, গতি নিরুদ্দেশ।
যেখানে তোমারে পাব সেথা যাত্রা শেষ।

প্রাণ যাকে চায়, কোথায় সে ? হয়ত কাছে, হয়ত সাত সমুদ্র তের নদীর পারে, হয়ত বা অন্তরেই। যেখানেই হোক প্রেমপরিক্রমার পূর্ণচ্ছেদ রয়েছে এই লব্ধির সমাপ্তিতে।

দরদের কি মধুর ছবিটি দেখুন ঃ

ছিঁড়িওনা ফুলটিরে।
এসেছে অলিরা, কেঁদে তারা যাবে ফিরে।

সর্বহারার বেপরোয়া উক্তি ঃ

নীড় পুড়ে গেছে ? যাক্ না।
এ পাখীর আছে পাখ্ না।

অনন্ত আকাশ তার বিহারক্ষেত্র। বনে বনান্তরে তার নবকুলায়রচনা স্বাবলম্বী পক্ষদুটির প্রসাদে।

রূপসীর কদর্য অভিরুচিতে কবির বিতৃষ্ণা ঃ

ময়ূর যখন সাপ ধরে ধরে খায়,
পেথমের মোহ এ নয়নে উবে যায়।

জাপানী কবির চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা সুন্দরকে বীভৎস ক'রে তুলেছে একটি ছত্রে।

আর একটি ছবি দেখুন ঃ

তিমির-কলাপী গুটাল পক্ষ তার।
তারকা খচিত বিপুল পুচ্ছভার
লুটায়ে গগনে ধীরে ধীরে চলে যায়,
কাঁদি নিশিভোর অসহ প্রতীক্ষায়।

আঁধার রাত্রি ময়ূরের মত পেখম গুটিয়ে আকাশভরা অন্ধকার যেন ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলে যায়। ব্যর্থ প্রণয়ীর দীর্ঘ প্রতীক্ষা অশ্রুবন্যায় যায় ভেসে। নিশান্তের এই বিরহচ্ছবিখানি কথার আড়ালে ভোরের আকাশ ভরে ফুটে ওঠে।

কর্মৈষণার মূলে আছে আদর্শের প্রবর্তনা, আমাদের শক্তি-প্রস্রবণ (বিজ্ঞানীরা Ductless gland এর Secretion বলেন)। আজ যেটা স্বপ্নকল্পনা মাত্র, কাল সেটা দানা বাঁধে সঙ্কল্প ও সাধনার বীজে, উদ্ভিন্ন হয় সাফল্যের কর্মক্ষেত্রে। কথাটা বিশ্বাস করি বলেই মন যখন বলে—বয়োগতে কিং কবিতাভিলাসঃ —তখন প্রাণ বলে, স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টা 'কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ'। তিনি কবি, তাঁর সৃজনলীলার ছন্দসুর ঝঙ্কৃত আমাদের হৃৎস্পন্দনে। তিনি মনীষী, মনের নিয়ন্তা। তাই 'যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি'। বৃদ্ধেরও ঘাড়ে ধ'রে তাকে কাব্যচর্চা করান। তিনি পরিভূ, সবার উপরে। এই শ্রেষ্ঠত্বের আভাস মানুষ পায় রসানুভূতিতে। হিংসা দ্বেষ জর্জরিত সংসারে তাই সে বলে ঃ

সংসারবিষবৃক্ষস্য দ্বে এব মধুরে ফলে।
কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সজ্জনৈঃ সহ॥

জীবমাত্রেই আজন্ম আনন্দপন্থী। যে পথেই হোক, সে যখন আনন্দের অধিকারী হয় তখন সে ক্ষুদ্রত্বের সীমাকে অতিক্রম করে যুক্ত হয় নিখিল মানবের সঙ্গে, তখন বিজ্ঞানী হন বিজ্ঞানানন্দ, ভক্ত হন প্রেমানন্দ, দেশপ্রেমিক হন দেশানন্দ। এঁরাই ত সজ্জন। এঁদের সান্নিধ্য আমরা ঘরে ঘরে পাই পুস্তকাকারে। অনুবাদের সাহায্যে প্রাচ্য ঋষিদের সঙ্গে প্রতীচ্যের মহাপুরুষদের বাণীময় মূর্তি প্রত্যক্ষ করি আমাদের পুঁথিশালায়। তিনি স্বয়ম্ভু। এ সত্যের পরিচয় পাই আমাদের এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনে আত্মসৃজনের রহস্যে। মানুষ ইহজন্মেই আপনাকে উর্ধাধোযোনিতে ভূমিষ্ঠ করে আত্মকর্মফলে। রূপ থেকে রূপান্তরে জন্ম থেকে জন্মান্তরে পুণ্যপাপের ভিতর দিয়ে নিজেকে উত্তীর্ণ করে চলেছি। অনন্তজ আমরা। সংখ্যাতীত জন্ম আমাদের এই স্বয়ংসৃষ্টির লীলায়। রূপ থেকে যেমন অপরূপে উন্নীত করি আপনাকে, তেমনি আবার পঙ্ক হতে পঙ্কিলতম বীভৎসতায় পরিণত হই নরকের কৃমি কীটে। কাব্যানুবাদের ভিতর দিয়ে সর্বদেশের সর্বকালের কবিদের বাংলার বাণীপীঠে কেবল উপনীত করি না, সেই সঙ্গে এই রসসাধনায় নিজ নিজ অন্তরে শক্তি ও আনন্দের উৎস আবিষ্কার করি।

সবশেষে একটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ও শান্তিনিকেতনে বিদেশী বিদ্বান ও বিদুষী অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। তাঁদের ও বাংলার কবিদের

নিয়ে যদি একটি অনুবাদ-সমবায়বিভাগ খোলা যায় তবে "অন্ধখঞ্জের ন্যায়" এই অনুবাদ কার্যে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। রসগ্রাহী বিদেশী অধ্যাপক বা তাঁদের নিজ নিজ দেশের সেরা কবিতার কথাগুলি যদি হুবহু ইংরেজিতে তর্জমা করে দেন এবং সেই সঙ্গে কথার অস্পষ্টতার আড়ালে যে ভাব বা ইঙ্গিত অব্যক্ত আছে সেটা ভাল করে বুঝিয়ে দেন, তাহলে কবিতাগুলির বঙ্গানুবাদ সুসাধ্য হতে পারে। এই সঙ্গে একজন সাহিত্যরসিক ইংরেজকে যদি পাওয়া যায়, তবে ত পাথরে পাঁচ কিল। আমরা মোটামুটি দো-ভাষী ইংরেজি বাংলায়। ইংরেজি ভাষাকে এক্ষেত্রে যখন ভাববিনিময়ের medium বা সেতুস্বরূপ করতে হবে তখন একজন ইংরেজের মধ্যস্থতায় 'নেতির' ভিতর দিয়ে 'তদিদমে' পৌঁছবার অনেকটা সুবিধা হবে। অর্থাৎ তিনি বিদেশী ও আমাদের অপটু ইংরেজি প্রতিবাক্যের বদলে ঠিক লাগসই কথাটি যোগাতে পারবেন।

'রবিবাসর' যদি শান্তিনিকেতন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এই অনুবাদকাব্যসৃষ্টির ব্যবস্থা করবার জন্য উদ্যোগী হন তাহলে হয়ত সুফল ফলতে পারে।

সাহিত্যে শুচিতা

ব্রাউনিঙ্ তাঁর One Word More কবিতাটির একস্থানে বলেছেন যে, চিত্রকর রাফেল, 'জন্মের মধ্যে কর্ম্ম চৈত্র মাসে রাস' একবার মাত্র করেছিলেন। অর্থাৎ আজীবন তুলি-পেশার পর একটিবার মাত্র একটি সনেট লিখেছিলেন তাঁর প্রিয়ার উদ্দেশে। আমিও আমার পরমপ্রীতিভাজন ওদুদ্ সাহেবের পাল্লায় পড়ে এই প্রথম অনধিকার চর্চায় হাতে-খড়ি নিলাম। 'পুত্‌লো বাজি'র নাচে যে লোকটা সুতো টানে আসলে সেই নাচে এবং তার সুরেই 'ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়ার পুঁটুলি' কথা কয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আমার ত্রুটিপ্রমাদের 'ওয়ারিশান' ওদুদ্ সাহেব।

যে প্রসঙ্গের অবতারণা—অবতারণামাত্র—আজ আপনাদের সম্মুখে করতে সাহসী হয়েছি এ বিষয়ে হাটেঘাটে সর্বত্রই একটা কাণাঘুষা চলছে; সুতরাং ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অনেক কথা কানে আসে এবং কথার পাল্টা জবাব জিহ্বাগ্রে আসতে চায়। বোবার সোনালী গাম্ভীর্যের চেয়ে বাচালের রূপালী মুখরতা নিকৃষ্ট হলেও, "বিতরতি সময়-বিশেষে চিঞ্চা পঞ্চামৃতামোদং।" অবস্থা বিশেষে মানুষ পঞ্চামৃত ফেলে তেঁতুলের অম্বলের বাটিতে চুমুক দেয়। আমার আজকার আচরণেও হয়ত এমনি ধৃষ্টতা লক্ষিত হবে।

বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং। মোটের উপর সাহিত্য সম্বন্ধেও ওই একই কথা, সাহিত্যের প্রাণবস্তু রস। এখন প্রশ্ন এই: রসবস্তুটি কি? যার আস্বাদন মধুর তাই-ই রসস্বরূপ। প্রাচীন বিশেষজ্ঞেরা রসকে নববীজাত্মক বলেছেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই নয়টির মধ্যে যেটিই বোনা যাক্ না কেন, তার ফলে যদি মধুর আস্বাদনটুকু না জাগে, তা হলে সে বীজ নিষ্ফল হল বলতে হবে।

এই মাধুর্যের অনুভূতি নিয়েই মতদ্বৈধ হবার সম্ভাবনা। কথায় বলে 'চাষা কি বোঝে মদের তার্!' শৈবলিনীর প্রেম-সম্পর্কে মরণপথযাত্রী প্রতাপ ব্রহ্মচারীকে বলেছিলেন 'কি বুঝিবে তুমি সন্ন্যাসী!' আজ এই অরসিক বৃদ্ধের মুখে রসতত্ত্বের অবতারণা শুনে হয়ত আমার তরুণ বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ অরুণ আঁখি হ'য়ে বলবেন: 'কি বুঝিবে তুমি বৃদ্ধ?' প্রাচীন কবি মনের দুঃখে চতুরাননের নিকট আর্জি করেছিলেন: 'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ।' তাঁর সেই সময় পাঠান্তর করে এও লেখা উচিত ছিল: 'অরসিকাচ্চ রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ।' অরসিকের কাছে রসের নিবেদন অথবা তার কাছ থেকে রসতত্ত্বের আবেদন দুই-ই তুল্যমূল্য অর্থাৎ বিড়ম্বনা। কিন্তু যে প্রার্থনাই করা যাক্ না কেন, সব সময় দেবতা প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন না, অষ্টকর্ণ হলেও। সুতরাং দায়ে পড়ে অরসিক ব্যক্তির নিকট রসের নিবেদন

করতে হয় এবং অরসিকপ্রমুখাৎ রসের অনধিকার চর্চাও বরদাস্ত করতে হয়। 'লিখিতমপি ললাটে প্রোজ্ঝিতুং কঃ সমর্থঃ ?'

তবে একটা কথা আমার স্বপক্ষে বলবার আছে। গানের আসরে যখন সঙ্গীতজ্ঞ গুণীর সমাবেশ হয় তখন পাড়ার হরে নোরে পরাণের দল গিয়েও জোটে। কেবল যে ঝামেলা করবার জন্যে, তা বললে বেচারীদের উপর বোধ হয় কিঞ্চিৎ অবিচার করা হয়। তারা নিশ্চয়ই কিছু আনন্দ পায়। সে আনন্দের মূল্য তাদের নিজেদের কাছে সব সময়েই আছে এবং আজ এই ঘনায়মান বলশেভিক যুগে ইচ্ছায় হ'ক, অনিচ্ছায় হ'ক, আপামর সাধারণ আমরা সকলেই যখন শূদ্রতান্ত্রিক শাসনের অনুকূল তখন সেই অত্যাধুনিক ডিমক্রেসির দোহাই দিয়ে man in the street-এর point of view অর্থাৎ পথের লোকের মতামতের প্রতি একটু নেক্‌নজর আকর্ষণ ক'রে আপনাদের ধৈর্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

সুন্দর আমরা অনেক জিনিষকেই বলি এবং সৌন্দর্যের তারতম্যের আর অবধি নাই। তবু এই বিচিত্র সৌন্দর্যের মধ্যে কতকগুলির কপালে যেন একটা চিরন্তন সৌন্দর্যের ফোঁটা আছে। কুলে শীলে এরা নৈকষ্য ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রে বলে জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ, ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ। আমি এই বিশিষ্ট অর্থে ব্রাহ্মণ শব্দটি এখানে ব্যবহার করছি।

চিরসুন্দরই রূপব্রহ্ম। যে সৌন্দর্যে নিত্যমাধুরীর একটা আভাস বা ইঙ্গিতমাত্র আছে তার গলায় সাহিত্যোক্ত যজ্ঞোপবীত পরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। চিরসুন্দর, নিত্যমাধুরী, ব্রহ্ম প্রভৃতি কতকগুলি গুরুবাক্য ব্যবহার করে ফেললাম। কি জন্যে কথাগুলি প্রয়োগ করলাম বলতে চেষ্টা করব।

আমরা সকলেই জীবনের অভিজ্ঞতায় জানি কতকগুলি ক্ষুৎপিপাসা আছে যা অন্নপানের মত পূর্ণতৃপ্তিতেই মিটে যায়। তাদের সঙ্গে আমাদের নগদ কারবার। উভয় পক্ষেই কোনো দেনা থাকে না। জীবনে এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকলেও কাব্যেসাহিত্যে এদের স্থান খুঁজে পাই নে। আমাদের সকলের ভিতরই সৌন্দর্যবোধ ব'লে যে জিনিষটি আছে তা আমাদের প্রত্যেকের অন্তঃপ্রকৃতির অনুপাতে। এই নিয়ে আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিভিন্নতা ও বিরোধ থাকলেও একটি বিষয়ে বোধ করি সাদৃশ্য আছে। যা সুন্দর তার মুখে এমন কিছু আছে যার জোরে সে অবলীলাক্রমে প্রাণের শীর্ষস্থানটি অধিকার করে বসে, আর সবাইকে পিছনে ঠেলে ফেলে। জনতার ভিতর একখানি সুন্দর মুখ অন্য মুখগুলিকে নিমেষে নিভিয়ে দেয়। যে মুখটি আমার ভাল লাগল সেটা তোমার ভাল না লাগতে পারে, কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অন্তরের উচ্চাসনখানি সেই প্রিয়দর্শনের জন্যে পেতে দেই। এই যে preferential

treatment বা পক্ষপাতিত্ব, এ রাজস্বের মতই সৌন্দর্য জোর করে আদায় করে এবং সেজন্যে মনে নন্‌কোঅপারেশন জাগায় না। বরং তাকে স্বশ্রদ্ধ অভিবাদন করি।

দ্বিতীয়ত, আমাদের পরস্পরের মধ্যে অনুভূতির পার্থক্য থাকলেও আমরা সকলেই বুঝি A thing of beauty is a joy forever. যা সুন্দর তার আনন্দের অন্ত নেই। দেশে কালে তা নিরবধি। সাহিত্যরচনায় এই দুটি লক্ষণ আমরা খুঁজি এবং এদের আমেজ যদি কোনো লেখায় জাগে তবে তাকে সৎসাহিত্য বলতে আমাদের দ্বিধা হয় না। সৌন্দর্যের এই স্বাভাবিক আভিজাত্য বা বিশিষ্টতা আছে। বুঝি এই সৌন্দর্যবোধ সেই অমোঘ অন্ধানুভূতি যা সৃষ্টি-শতদলের নব নব দলগুলি যুগ যুগান্তর ধরে উদ্ভিন্ন ক'রে চলেছে। বাঁদরকে করেছে মানুষ, মানুষকে করতে চেয়েছে মহামানব। তৃতীয়ত আর একটি কথা বলতে চাই। ধরুন বেলফুল। কতটুকু পরিসর তার আকাশে, কতটুকু আয়ু তার কালে? কিন্তু বাস্তবিক বেলফুলটির প্রকৃত স্বরূপ আমাদের কাছে কি কেবল দেশ কালেই বদ্ধ? যদি তার সৌরভটি চোখে দেখতে পেতাম তাহলে হয়ত দেখতাম যে, ক্ষুদ্র পাপ্‌ড়িসমষ্টির কেন্দ্রবিন্দুটি আশ্রয় ক'রে একটা সৌরভের জ্যোতির্মণ্ডল তাকে ঘিরে আছে। যতদূর সে সুগন্ধ ছড়িয়ে যায় ততদূর পর্যন্ত তার পুষ্পদেহের পরিব্যাপ্তি। কিন্তু এখানেও শেষ কথা বলা হল না। সেই সুগন্ধের সঙ্গে মনে যে আনন্দের অনুভূতি

জাগে এবং সেই আনন্দচেতনার সঙ্গে পূর্বানুভূত সুখস্মৃতির ঝঙ্কার যদি বেজে ওঠে, তা হলে দেখুন কি দৃশ্যপটই চোখের সম্মুখে উন্মুক্ত হয়ে যায়! রবীন্দ্রনাথ যখন বললেন 'ফুল দেখে মনে পড়ে কারে ভালবাসি' তখন সে কবির চোখে ফুলের যে বিরাট বিশ্বরূপ ফুটে ওঠে সে ছবি তুলিতে আঁকতে হলে চিত্রপটখানি দিকচক্রবাল পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে যায়, সুদূর অতীতকে আপনার চিত্রবন্ধনীর মধ্যে টেনে আনে।

ধ্বনি-বিজ্ঞানে বলে যে প্রত্যেক স্বরটির একটি মৌলিক সুর বা Fundamental note আছে। বেহালার 'সা' বা হার্‌মোনিয়ামের 'সা' মূলত একই সুর, কান বলে তাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে, যার দ্বারা কোন্ যন্ত্র থেকে সুরটি বের হচ্ছে তা ধরতে কিছুমাত্র মুশ্‌কিল হয় না। কী সে বিশেষত্ব? বিজ্ঞান বলে যে, মূল সুরটিকে ঘিরে অনেকগুলি Harmonics বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক্ষীণধ্বনির অনুরনণ আছে। তারা মূল সুরটিকে বজায় রেখে তাকে বিশেষ বিশেষ রঙে যেন অনুরঞ্জিত করে, কালো মেয়ের মুখে সায়াহ্নের সোণার আলো যখন পড়ে তখন সে মুখে যেমন ত্রিদিবকান্তি ফুটে ওঠে। সাহিত্য সেই অনুরঞ্জনা যা বস্তুতান্ত্রিকের স্থূলরূপের উপর একটা অনির্বচনীয় অতীন্দ্রিয় আভা মাখিয়ে দেয়। তখন সুঅন্দরও সুন্দর হয়, তখন বেহালার ছড়ের মধুনিষ্যন্দিনী সুরধারার সঙ্গে হারমোনিয়ামের কাংস্যনিনাদিনী মধুস্রবার প্রভেদ বুঝতে আর বেগ পেতে হয়

না। কাগজের ফুলে গোলাপী আতর মাখিয়ে দর্শকের চক্ষু নাসিকায় ক্ষণবিভ্রম উৎপাদন করা যেতে পারে, কিন্তু তার পাশে সদ্যস্ফুট গোলাপ যদি রাখেন তাহলে দেখবেন যে ভ্রমর উড়ে গিয়ে সেই সাচ্চা গোলাপটির উপরই বসবে, তা পার্শ্ব-বর্ত্তিনীর যতই রঙের বাহার ও গন্ধের তীব্রতা থাকুক না কেন!

Realism in art নিয়ে যে বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যের আমদানী আজকাল বাজারে দেখা দিয়েছে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলেও একেবারে চোখাচোখি হয় নি তা নয়। তাদের দেখে আমার যা মনে হয়েছে তা বলি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যখন আমার হ্যাট্‌কোটপরা ইঙ্গবঙ্গ মূর্তিটি দেখি তখন যে হাস্যকর চিত্রটি চোখে জাগে, এই সব রচনায় তার আদল পাই। তত্র যে Continental Literature-এর দোকান থেকে Hat, coat, tie এর আম্‌দানী সব সময় হয় তা নয়, কিন্তু যে নগ্নতা পশ্চিম-সাহিত্যে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে সেই বেয়াব্রু রচনার একটা সচেষ্ট নির্লজ্জ অনুকরণ আছে। একটা কথা ভুললে চলবে না যে বেশভূষা সম্বন্ধে যে একটা কলাবিধি বা Æsthetic Convention আছে, তা দেশে দেশে কালে কালে বিভিন্ন। কিন্তু মনের উপর প্রতিক্রিয়া হিসাবে তাদের পরস্পরের মধ্যে নিকট আত্মীয়তা আছে। নারীর নগ্ন পদ আমাদের দৃষ্টিকটু নয়, কিন্তু পাশ্চাত্য রুচির চক্ষুশূল। সেইরূপ যে সব দেশে ও সমাজে স্ত্রী পুরুষের মুক্ত গতিবিধি ও

অবাধ মিলনের আনুকূল্য আছে, তাঁদের সে স্বৈরগতি ও অকুণ্ঠিত আচার ব্যবহার রুচি ও নীতিকে আঘাত দেয় না এবং সকল স্থলে বিতৃষ্ণাও উৎপাদন করে না। দেশভেদে ও পাত্রপাত্রীভেদে এরূপ আচরণ সঞ্চরণ ন্যক্কারজনক হতে পারে। নীতিবাগীশের তরফ থেকে একথা বলছি না। রূপদক্ষের সমীভূত দৃষ্টিতেও সে দৃশ্য দৃষ্টিকটু ও শ্রুতিতে বেসুরা লাগতে পারে, সেই কথাই বলতে চাই। সাহিত্যে কতটা পরিমাণে আবরণ খসান যেতে পারে তার কোন ধরাবাঁধা আইন কানুন আছে বলে মনে হয় না। তবে এ কথা ঠিক, যে প্রকট নগ্নতা এক স্থলে কোন গ্লানি উৎপাদন করে না, অন্যত্র তা বীভৎস হয়ে দাঁড়ায়। কেন? বলা শক্ত। তবে মনে হয় প্রকাশ বা অপ্রকাশ আসল কথা নয়, আসল কথা যে-আলোকে যবনিকার উত্থান পতন হচ্ছে সেই আলোকের এমন একটি অনির্বচনীয় শক্তি আছে যা অসুন্দরকে সুন্দর এবং সুন্দরকে কুৎসিৎ করতে পারে, সুরুচি কুরুচির মুখ বদল করে দেয়। সূর্যালোক লাল কাচের ভিতর দিয়ে আসলে ফটোগ্রাফের কাচে কালি মাখায় না। সেইরূপ রূপদক্ষ প্রাণের প্রদীপে যে শিখাটি জ্বেলে নেন সে আলোয় কোন্ ছবিটি কতকক্ষণ কি ভাবে ধরবেন যাতে বিরক্তি বিতৃষ্ণা বা কলুষের সৃষ্টি করবে না, তা তাঁর অভিজ্ঞ দৃষ্টি ও নিপুণ লেখনীর উপর নির্ভর করে। বাইসিকেলের দু চাকার উপর ভারকেন্দ্রটি ঠিক রেখে আছাড় না খেয়ে চলার

প্রধান সহায় গতি। যে লেখকের রচনায় গণ্ডীর ভিতর বাস্তবের ভিতর একটা কল্পলোকাভিসারিণী গতি আছে তিনিই কর্দমাক্ত পথে অচলপ্রতিষ্ঠা লাভ না ক'রে সৌন্দর্যের অমৃতলোকে উত্তীর্ণ হতে পারেন, আর আমাদের মত অপটু লোকেরা তাঁদের পিঠে ভর রেখে চক্রবাহনে বিনা মাশুলে বিনা বিপত্তিতে সাদা কাপড়ে বাণীমন্দিরের দেউড়িতে পৌঁছতে পারে। সীমার ভিতর সীমাতীতের ব্যঞ্জনা, অপূর্ণতার ভিতর পূর্ণতাভিমুখী ইঙ্গিত, জড়ের ভিতর অতীন্দ্রিয়ের ঝঙ্কার যে লেখার ফাঁকে ফাঁকে আছে, সেই রচনাই সাহিত্য-পদবাচ্য।

আমরা দেহী জীব হলেও এই রক্তমাংসের বনেদের উপর আমাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা অনুভূতি দিয়ে একটি ইমারত গেঁথে চলেছি। দেহলোকের উপর এ-ই আমাদের স্বরচিত অধ্যাত্মলোক। এই লোকেই বাণীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের পাষাণ ভিত্তির ফাঁকে যারা গর্ত ক'রে কুরে কুরে মাটি বার করে তাদের এই মুষিকবৃত্তিকেই সাহিত্যে কুরুচি বলছি। সুখদুঃখ পাপপুণ্য অবিচার অত্যাচার নিয়ে আমাদের সামাজিক জীবন। এদের সকলেরই সৎসাহিত্যে স্থান আছে। কিন্তু সাহিত্যিককে পঙ্ক থেকে পঙ্কজ ফুটিয়ে তুলতে হবে, পঙ্কজ থেকে পঙ্কোদ্গীরণ করা তাঁর ধর্ম নয়।

কাব্যের ও কথাসাহিত্যের একটা প্রধান মৌলিক উপাদান নরনারীর প্রেম। স্ত্রী পুরুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ

প্রাণসৃষ্টির মূলে। মানবসভ্যতা বহু যুগব্যাপী সাধনায় একে চাপে পিশে ছাঁচে ঢেলে দাম্পত্য প্রেমের আকার দান করেছে। মানবের এষণা ও চেষ্টায় যার সৃষ্টি তা এক হিসাবে কৃত্রিম, সহজিয়া নয়। সামাজিক বিধি নিষেধের ভিতর দিয়ে দেশে দেশে কালে কালে স্ত্রী পুরুষের যে আত্মীয়তার ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে তা প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে এক পথ দিয়ে চলে নি। পূর্ব এবং পশ্চিম দুই-ই নরনারীকে শৃঙ্খলিত করেছে বটে কিন্তু এই গ্রন্থিবন্ধনের প্রণালীর ভিতর মূলত পার্থক্য আছে। পশ্চিমে পাত্রপাত্রীর পরস্পর মনোনয়নের পথ আমাদের দেশের তুলনায় অনেকটা অবারিত। আমাদের দেশে সহজিয়া ব্যবস্থা যে একেবারে ছিল না তা নয়, তবে সাধারণত প্রাগ্‌বৈবাহিক পূর্বরাগের ব্যবস্থা ছিল না, পশ্চিমে আছে। বর্তমান যুগে পশ্চিমের হাওয়া আমাদের দেশের উপর উত্তরোত্তর প্রবল ভাবে বইছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক আটচালায় ভাঙনের মড়মড়ানি স্থানে স্থানে জেগে উঠেছে। সেই ঝোড়ো হাওয়া লেগেছে কথাসাহিত্যে। সাহিত্য সমাজের ভড়ে পালের হাওয়া। সুতরাং উনপঞ্চাশ বায়ুর ফুৎকার এই ভরা পালে লাগবেই। কিন্তু নোঙর গেড়ে হালে দাঁড়ে মাঝি দাঁড়ি না বসিয়ে যদি কেবল ঝোড়ো হাওয়ায় পাল মেলে দেওয়া যায় তাহলে তীরে বসেই হয় নৌকোডুবির সুব্যবস্থা।

মুক্ত বাতাসের মতই সাহিত্যের মুক্তগতি। তার সদর অন্দর নেই। অসূর্যম্পশ্যার কাছেও সে অবাধ প্রবেশাধিকার লাভ করে। সামাজিক রীতি নীতির মর্যাদা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে যদি তরুণ কথাসাহিত্য কঞ্চুকীর মত অন্তঃপুরচরোবৃদ্ধে'র নিরঙ্কুশ গতিবিধি লাভ করে তা হলে 'যথারণ্যং তথাগৃহং'-এর অবস্থায় সমাজকে পৌঁছতে বিশেষ বিলম্ব হবে বলে মনে হয় না। স্ত্রীস্বাধীনতা, বিধবা-বিবাহ, যৌবনবিবাহ, এমন কি স্থল বিশেষে 'ডাইভোর্সে'রও প্রয়োজনীয়তা না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু এ সব সমাজসংস্কারের ব্যবস্থা যদি এক দল গুণ্ডা ও দুর্বৃত্তের হাতে দেওয়া যায়, যারা গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে প্রবেশাধিকার লাভ ক'রে Free love বা অবাধ প্রেমের সুসমাচার প্রচার করবে এবং পৌরোহিত্যের কর্তব্যভার বহন করবে, তাহলে গ্রামবাসী রমণীদের পিতা ভ্রাতা প্রভৃতি নিকট আত্মীয়েরা এই নবীনপন্থীদের কিরূপ অতিথি সৎকার করবেন তা অনুমান করা কঠিন নয়। একটু প্রণিধান করে দেখলেই বোঝা যায় যে উক্ত মহোদয়রা সশরীরে প্রবেশাধিকার আপাতত না পেলেও সূক্ষ্মদেহ ধারণ ক'রে অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকারের জন্যে সাহিত্যিক Passport বা ছাড়পত্র সংগ্রহের চেষ্টায় আছেন। এরূপ লেখকসম্প্রদায়ের আবির্ভাব সম্প্রতি সাহিত্যে দেখা দিয়েছে। তবে এদের তাড়াবার ভার বোধ করি পুরুষদের না নিলেও চলে। যাঁদের কল্যাণ হস্তের সম্মার্জনী এখনও বাংলার ঘরে ঘরে গৃহের

আবর্জনা ঝেঁটিয়ে আঁস্তাকুড়ে ফেলে তাঁরাই এদের সদ্গতি করবেন। নীতি জিনিষটা কেবলমাত্র বিধি নিষেধ নয়, এটি Instinct of Self-preservation, আত্মরক্ষার অমোঘ অস্ত্র। প্রাণের ধর্ম প্রাণরক্ষা। ভাবী দেশমাতৃকারা দশভুজা হয়ে দশসম্মার্জনীধারিণী হবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে। সব সমাজেই গলদ আছে। আমরাও সৃষ্টিছাড়া সাধু নই। আমাদের সমাজকে ভেঙে গড়তে হবে এবং সেই জীর্ণসংস্কারের প্রধান অস্ত্র সাহিত্য। সে অস্ত্র যেন 'ভালুকের হাতে খোন্তা' না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। সাহিত্যে শুচিতা পাপীকে বা পতিতাকে ঘৃণা ক'রে রক্ষিত হয় না, রক্ষিত হয় পাপকে ঘৃণা ক'রে, জঘন্যতাকে দূর ক'রে।

মনে পড়ে বিলেতে কসাই-এর দোকানে বড়দিনের উৎসব-সজ্জা দেখেছিলাম। শ্বেতপাথরের টেবিলের উপর একটি ছালছাড়ান শূকরের মুণ্ড, তার কানে ও নাকে ফুল গুঁজে গলায় মালা দিয়ে তাকে সাজানো হয়েছে। বর্তমান সাহিত্যে এরূপ রক্তমাংসের পূজার আয়োজন আমার চক্ষে পড়েছে। ঘোরতর মাংসাশীর পক্ষেও এরূপ দৃশ্যে রসভঙ্গ হয়। মাংসের পূজা ফুলে নয়, পেঁয়াজ, রশুন, গরমমসলায়। আর্টের এমন বীভৎস দুর্গতিও মাঝে মাঝে দেখতে হয়!

উপসংহারে আর একটিমাত্র কথা বলে বক্তব্য শেষ করি। উদীয়মান তরুণ সাহিত্যিকদের ভিতরে এমন সব লেখক দেখা দিয়েছেন যাঁদের ললাটে নবরবির অনাবিল দীপ্তিচ্ছটা

আছে। তাঁরা সকলেরই অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রীতি আকর্ষণ করেছেন। পুরাতনকে ভেঙ্গে যখন নবসৃষ্টির অভ্যুদয় হয় তখন তার বিদ্রোহ, প্রমত্ততা, আবেগান্ধতা উদ্দাম হয়ে ওঠে। বিজয়ী সেনাপতি যখন প্রাচীন দুর্গের পর দুর্গ ধূলিসাৎ ক'রে দিয়ে অগ্রসর হ'ন তখন সে জয়যাত্রার ধূলির অন্তরালে সামরিক অরাজকতা বিশৃঙ্খলার সুবিধা নিয়ে দুর্বৃত্তের দল নারীনিগ্রহ, পরস্বাপহরণ, বৈরনির্যাতন ইত্যাদি পাশবিক অত্যাচারের 'মরশুম' পায় এবং 'নলিচার আড়ালে গুড়ুক ফুঁকে নেয়'। ধর্মযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে নৃশংস বর্বরতার বাঁধভাঙ্গা বন্যার ঢল নামে। বাংলা সাহিত্যে নবযুগ আনতে যাঁরা বদ্ধপরিকর তাঁদের বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক যে তাঁদের প্রচেষ্টার আশ্রয়ে এই সাহিত্যিক দুর্বৃত্তেরা প্রশ্রয় না পায়। উচ্চ আদর্শ হৃদয়ে ধারণ ক'রে যিনি ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন ইতিহাস তাঁর সাত খুন মাপ করে। কিন্তু কেবলমাত্র পাশবিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই চরমরূপ ধারণ যাতে না করতে পারে সেজন্যে প্রবর্তকদের আত্মসংযমের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিরাখা কর্তব্য। কারণ পশুরাজ আমাদের সকলের ভিতরেই বিদ্যমান। দশভুজার বাহনও কেশরী। কিন্তু সোয়ার হুঁসিয়ার না হলে বিদ্রোহী বাহনের নখদন্তে উচ্চাদর্শের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনায়াসেই নিষ্পন্ন হতে পারে। সত্য বটে, স্রষ্টা প্রাণের আনন্দেই সৃজন করেন। কিন্তু দ্রষ্টাকে একেবারে বাদ দিয়ে নয়। কারণ মানুষ আপনার শ্রেষ্ঠ সার্থকতা লাভ করে

অপরের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে, বিশ্বের সহিত নিবিড়তম যোগের দ্বারা। সুতরাং সত্যংকে শিবং হতে হবে। এবং প্রীতির বন্ধন, যিনি সুন্দরং কেবল তিনিই বাঁধতে পারেন। যা কদর্য অসুন্দর তা আনন্দকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। মেঘমালার মতই কাব্যসৃষ্টির ঋজুবঙ্কিমরেখাধৃত সুনির্দিষ্ট আকার আয়তন নেই। কিন্তু বায়ুবিজ্ঞানের মতে মেঘেরও শ্রেণীবিভাগ আছে, কালাকাল আছে, যার সঙ্গে ধরণীর শুভাশুভ নিত্যযুক্ত। মেঘরাশি কখনও বা উষরক্ষেত্রের শ্যামলিমার উর্বরতার রসধারা, কখনও বা ঝড়ঝঞ্জাঅশনি-সম্বলিত মহাপ্রলয়ের বারুদখানা। অন্ধ প্রকৃতির সৃষ্টিলীলায় প্রজননী রক্ষণী ও বিধ্বংসিনী শক্তির বিচিত্র ঘাতপ্রতিঘাত। কিন্তু এই চিরবৈচিত্র ও বিরুদ্ধতার ভিতর মানবকল্পনা সত্য শিব সুন্দরের একটি মূর্তির ছায়া দেখতে পেয়েছে। কারণ এই যে, ঐক্যের একটি অখণ্ড তাৎপর্য তার প্রাণে আছে। মানুষ স্বয়ং যেখানে স্রষ্টা, সাহিত্যের সেই সৃজনক্ষেত্রে এই Harmony বা সুগভীর সমন্বয়ের ঐক্যতানটি তার প্রাণে সজাগ রাখতে হবে, নতুবা তার সৃজন সার্থকতা লাভ করবে না।

পূর্বেই বলেছি এই দেহই অধ্যাত্মলোকের বনেদ। এই ইন্দ্রিয়ের তারেই অতীন্দ্রিয় সুর বাজে, বেতার বীণায় নয়। যে সভ্য নর সমাজের স্রষ্টা সাহিত্য তারই আধ্যাত্ম সৃষ্টি। আজ যা চিন্তনে ও ধ্যানে, কাল তা-ই উদ্ভিন্ন হবে জীবনে,

গৃহপরিবারে, সমাজে। সাহিত্যিক ঋষির ন্যায় মন্ত্রদ্রষ্টা। তিনি আজ যা চোখে দেখছেন অনাগত ভবিষ্যতে তাকেই আমরা সমাজে রাষ্ট্রে মূর্তিমান দেখব। সেইজন্যে সাহিত্যি-ককে ঋষির সম্মান দিতে চাই। 'জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং' তরুণ সাহিত্যিকদের আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম করতে চাই। তাই বলি তাঁরা নমস্য হোন, 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধং' হোন তাঁদের সৃষ্টির ক্ষেত্রে।

গতানুদর্শন

আমার এক তরুণ বন্ধু মাঝে মাঝে আসেন আমার কাছে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি নানা বিষয়ের সংবাদ সমালোচনা শুনি তাঁর মুখে। অথর্ব বিচার-বুদ্ধির ফোগলা দাঁতে যথাসাধ্য চর্বণ করতে চেষ্টা করি এই আধুনিক সাড়ে-বত্রিশ ভাজা। আমি শ্রোতা, তিনি বক্তা। সুতরাং আমাদের এ দেনা-পাওনা চলে নির্বিবাদে। তাঁর হৃদয়ভার হয় লঘু, আমার শূন্য ঝুলিও ভরে ওঠে বিচিত্র তণ্ডুলকণায়।

আজ সন্ধ্যাবেলা কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বললেনঃ তিন পুরুষের তরুণ সম্প্রদায়ের সঙ্গে আপনার কারবার। রাতা-রাতি ত বুড়ো হন নি, একদিন আমাদের দলেই ছিলেন। শিঙ্ ভেঙ্গে বাছুরের দলে ভিড়ে পড়বার দুর্নাম আপনার আছে এবং নিজেও বলেন, বার্ধক্যটা আপনার মুখোস। বাংলার তরুণ মিছিলের প্রগতি সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি শুনতে ইচ্ছা হয়।

নাছোড়বান্দা ছেলে মাটির তল থেকে নবকিশলয়োদ্ভিন্ন আমের আঁঠিটাকে ঝুঁটি ধরে টেনে তোলে। শুধু তাই নয়, সেটাকে ঘসে ঘসে তার ফাটলটাকে করে ক্ষৌরমসৃণ। তারপর দেয় সজোরে ফুঁ, আমের আঁটি বেজে ওঠে।

তাঁর নির্বন্ধে পড়ে হঠাৎ কথা দিয়ে ফেললুম, দু একটা কথা কালি কলমে বলতে চেষ্টা করব। আমরা সেকেলে লোক, কথা দিলে কথাটা রাখবার উদ্বেগ মনে জাগে, সুতরাং কথা রাখবার জন্যেই কথা বলতে হল।

শুনেছিলাম একটা কথা, সত্যি মিথ্যে জানি না, গুলি-খোর না কি পূজোর নবমীর দিন বৎসরান্তে একবার গঙ্গাস্নান করে। ঘাটে বসে 'জলে নামব কি নামব না' এই স্বগতোক্তিতে অনেকক্ষণ ধরে হ্যামলেটের রিহার্স্যাল দেয়ঃ To be or not to be. এই বিতর্কের কোন সমাধান না করতে পেরে অবশেষে কাঁধের গামছাখানা ফেলে দেয় জলে। সেই মজ্জমান গলবস্ত্রটিকে উদ্ধার করতে গিয়ে তার বছরকি অবগাহন নিষ্পন্ন হয়। এ ক্ষেত্রেও দেখছি, একটা মৌখিক সত্য রক্ষা করবার জন্যে দুটো বাজে কথা বলতে হল। আমার তরুণ শ্রোতা রাগ করতে পারবেন না, কারণ এ কথাগুলো তাঁর আত্মাপরাধ বৃক্ষের ফল।

একদিন ছিলুম ইস্কুলমাষ্টার। অনেক ছেলের নাড়ী টিপে টিপে আঙ্গুলে কড়া পড়ে গেছে। সেই আঙ্গুলে এখন নস্যি টিপি। হয়ত তাম্রকূটপরাগের সঙ্গে আঙুলের ডগায় তাদের তারুণ্যবেপথুর কিঞ্চিৎ স্পন্দন আমার মগজে গিয়ে ভোঁ ভোঁ করে। তাদের মধ্যে কোন ধারাবাহিকতা বড় একটা নেই। তবু এক একটা গলার আওয়াজ আর পাঁচটা কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে জেগে ওঠে। মানুষের মনটা বাঙ্ময়।

ইন্দ্রিয়ের তারে তারে যে মৌন ঝঙ্কারটি অন্তরে বাজে, সেটা আত্মপ্রকাশ করতে চায় ভাষায়। ভূমিষ্ঠ হবার প্রচেষ্টায় কথাগুলো হয় শব্দ-ভ্রূণ। আমার নবীন বন্ধুর প্রশ্নে সেই কথার নীহারপুঞ্জ ঘনিয়ে উঠতে চায় বাণীর মৌখর্যে। কিন্তু কি বলি, কোন্ কথা দিয়ে আরম্ভ করি?

গঙ্গোত্তরী থেকে যাত্রারম্ভ ক'রে যদি গঙ্গার তীর ধরে বরাবর অগ্রসর হওয়া যায়, তবে তার ধারাপথটি কেমন করে প্রস্থ ও গভীরতা লাভ করল পরিস্থিতির পটপরিবর্তনের ভিতর দিয়ে তার একটা আভাস পাওয়া যায়। তরুণ বাংলার যে রুদ্ধ প্রবাহ পল্লীতে পল্লীতে বন্দী হয়ে আছে, তার সন্ধান কোন দিনই রাখি নি, আজও জানি না। আমরা শহুরে জীব। আমাদের মানসিক মোল্লার দৌড় নাগরিক মস্‌জিদ পর্যন্ত। যা কিছু অভিজ্ঞতা, সেটুকু পেয়েছি শহরের স্কুলকলেজের চৌহদ্দির মধ্যে, ইঁটের পাঁজার খোপে খোপে, রাজপথের গোলকধাঁধায়। আর যা সব পরোক্ষ, বই পড়ে লোকের মুখে শুনে।

মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজ পঞ্চাশ বৎসর আগে স্কুল-কলেজে পড়ত এখনকার মত। প্রাচীন সংস্কার ও বিধি-নিষেধের আচারবন্ধনগুলি মোটামুটি অক্ষুণ্ণ ছিল ঘরে ঘরে। ইতিমধ্যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও আদর্শ এ দেশে এসে শিকড় গেড়ে বসেছে এবং প্রাচীন সমাজের বুকে মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে ফাটল। সাহিত্যে তখন ছিল বঙ্কিমযুগের অস্তরাগ,

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহের আন্দোলন তখন থিতিয়ে পড়েছে। রামমোহনপ্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠানটির সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে বেপরোয়া সত্যনিষ্ঠ বিবেকপন্থী কেশবচন্দ্র, বিজয় গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির দ্বারা প্রাচীন সমাজের ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত চলেছে এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের অভ্যুদয়। তারপর এল রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দপ্রণোদিত রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের জাগরণ। আনি বেসান্টের থিয়সফিক্যাল সোসাইটির ঢেউও শিক্ষিত সম্প্রদায়কে নাড়া দিয়েছিল। চিন্তা ও ভাবলোকের অভিনবত্বের প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথকে তরুণ বাংলা পেল এই সময়ে। অনতিবিলম্বে এল স্বদেশী যুগ, বাংলা দেশ লাভ করল শ্রীঅরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র ও চিত্তরঞ্জনকে। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগের প্লাবন বন্যাপ্রবণ তরুণ বাংলাকে দিল অস্বীকারের পরাক্রম ও উত্তেজনার মধ্যে কর্মদীক্ষা। এই আন্দোলনের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, অসূর্যম্পশ্যা অন্তঃপুরচারিণীরা বহুদিনের অবরোধ প্রথাকে অকুতোভয়ে অতিক্রম করে অন্দর থেকে কতকটা বাহিরে এসেছেন। বাংলার সামাজিক জীবনে এটা একটা যুগান্তর।

পঞ্চাশ বছর আগে যাঁরা ছিলেন কিশোর বা যুবক আজ তাঁরা বৃদ্ধ। আমি সেই দলের একজন। পূর্ব ও পশ্চিমের নানা ভাব ও চিন্তার পুঞ্জমেঘে ভরা ছিল আমাদের আকাশ, তার উপর পড়েছিল নবরবির অরুণরাগ আমাদের পূর্বাশায়।

আমাদের আশার অন্ত ছিল না। সেটা ছিল রোমান্টিক যুগ, অর্থাৎ যখন তুরীয় লোকের স্বপ্নটা জীবনের চেয়ে অধিকতর সত্য মনে হয়। গণৎকার যখন হাত দেখে বলে, অদৃষ্টে আছে রাজ্যলাভ, তখন সহজবিশ্বাসী মন দৈবজ্ঞের কথায় আস্থা রেখে স্বয়ম্বরা রাজলক্ষ্মীর শুভাগমনের প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়। আমরা অনেকেই আপনি আপন করকোষ্ঠিতে ভবিষ্যতের চিত্রপট দেখি। আমাদের মধ্যে ক্বচিৎ এমন লোকও পাওয়া যায় যার পুরুষকার দৈবজ্ঞ ঠাকুরের গণনাকে সফল করে। আরকিমিডিস বলতেন: যদি একটা বিন্দুপরিমিত অচল কেন্দ্রভূমি পাওয়া যায়, আর সেই সঙ্গে জোটে একটা মজবুত হুড়কো, তা হলে ওই প্রতিষ্ঠা-বিন্দুর উপর ভর রেখে লাঠীর চাড়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ঠেলে তুলতে পারি। মানুষের জীবনে এই অটল ভিত্তি হচ্ছে সত্য। হোক বিন্দুপরিমাণ কিন্তু তার উপর নির্ভর রেখে সে বিশ্বজয়ী হতে পারে। চিরন্তন সত্য কি, সে তাত্ত্বিক বিচারে এখানে প্রয়োজন নেই। সব দেশে সব সময়েই মানুষের মনে বদ্ধমূল সংস্কার কিছু কিছু থাকে। সেই সংস্কারের বনেদের উপর সমাজসংসার গ'ড়ে ওঠে এবং আমাদের জীবনযাত্রা মোটামুটি নির্বিঘ্নেই চলে। কোন একটি ধারার প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে চাই তার জন্যে একটি পয়ঃপ্রণালী। আমাদের দেহে যে রক্তচলাচল হচ্ছে, শিরাউপশিরা তার অলিগলি। এই ধমনীগুলি যদি ফাটে তবে সর্বাঙ্গের অন্তস্তলে হয় রক্তপ্লাবন। প্রাচীন

আচারমার্গ কালধর্মে যখন অচল হয়ে আসে তখন সময়োপযোগী নতুন রাস্তা যদি প্রস্তুত না হয় সামাজিক ক্ষেত্রে, তবে বিপ্লবের ঢলে জলমগ্ন হবার আশঙ্কা উত্তরোত্তর বেড়ে চলে। আমাদের সামাজিক পূর্তবিভাগে নব্য ইঞ্জিনিয়ারের অভাব ছিল। নবযুগ তাই তরুণদের কর্মজীবনে প্রবেশের সহজ পথ পায় নি।

ফরাসী বিপ্লবের সময় রাস্তার এপারে ওপারে নোটের দামে ঘটেছিল মূল্যবিভ্রাট, নিরিখ বেঁধে দেবার কর্তৃপক্ষের অভাবে। কর্তৃপক্ষ সেখানে বে-এক্তার, যেখানে তাঁদের অভিসন্ধির বিশুদ্ধতার সঙ্গে জনমতের সমর্থন নেই। তাস খেলতে বসে কোন্‌টা রঙ তাই নিয়ে যদি মতদ্বৈধ থাকে, তবে প্রত্যেকবার তুরুপ করবার সময় বাধে মল্লযুদ্ধ। এক ফোঁটার গোলাম যেখানে বিশ ফোঁটা হয়ে টেক্কা তুরুপ ক'রে বসে, সেইখানে উভয় পক্ষে বেধে যায় হাতাহাতি। স্বদেশী বিদেশী নানা মতবাদের বৈপরীত্যে একটা কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা গত পঞ্চাশ বৎসর ধরে ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে। তার প্রধান কারণ বোধ হয়, কোন একটা বিশেষ 'আইডিয়া' বা আদর্শকে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরবার যে চরিত্রবল তার অভাব ছিল আমাদের জীবনে।

ভাব, চিন্তা ও আদর্শের সমতা যে পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলের মধ্যে ঐক্যলাভ করে সে আনুকূল্য পঞ্চাশ বছর আগে আমরা পাই নি। স্বাধীনতার প্রতি অন্ধ আকর্ষণ, বন্ধনবেদনার

অসহনীয়তা এসেছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে তিতিক্ষা ও দায়িত্ব-বোধকে জাগ্রত করতে পারে নি। নিজের কর্মফলে যে দুর্গতি মানুষ আপনার জীবনে টেনে আনে, তার জন্যে যখন সে অভিসম্পাত করে সমাগত আপদ্‌কে তখন তার আত্মাপরাধের স্মৃতি হয় বিলুপ্ত। এই স্মৃতিভ্রংশই বিনষ্টির অগ্রদূত। পুরুষানুক্রমে খাল কেটে কুমীর গ্রামের ঘাটে ডেকে আনা গেল, দল বেঁধে খালের কিনারায় দাঁড়িয়ে তাকে গালাগালি দিলে তার করাল গ্রাসের সঙ্গে পরিচয় হবার সম্ভাবনাই বেশী। রাজনৈতিক আন্দোলনের হিড়িকে পড়ে পরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে বিদ্বেষবুদ্ধিকেই উদগ্র করা হচ্ছে। অপরপক্ষের দোষ যতই থাকুক, আত্মাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ও পিতৃঋণ শুধবার দুষ্কর ব্রত পূর্ববর্ত্তী যুগের তরুণরা যে পরিমাণে গ্রহণ করতে অক্ষম হয়েছে, সেই পরিমাণে ঘর সামলাবার আগে প্রতিপক্ষের সঙ্গে অসম যুদ্ধে আত্মশক্তির অপব্যয় করেছে বেশী। পিঁজরের বাঘকে একটা তানপুরো দিয়ে ধ্রুপদী চালে হুঙ্কারে গলা সাধবার জন্যে বসিয়ে দিলে তার মুক্তির সম্ভাবনা নিকটতর হয় না। তার চোয়ালে, দাঁতে, থাবার নখে গরাদেকাটা তীক্ষ্ণতা ও শক্তিবৃদ্ধির ব্যবস্থা করলে হয়ত একদিন বনের বাঘ বনে গিয়ে হাঁফ ছাড়তে পারে। এই শক্তিসাধনা পূর্বতন যুগে তেমন হয়নি। সত্যের বীজকে প্রতিদিনের অভ্যাসযোগের দ্বারা উদ্ভিন্ন করতে হয় জীবনে। অপ্রমত্ত অনুশীলনের যে সাধনা তাতে

আমরা দীক্ষিত হইনি। সুর ও তাল নিয়ে সঙ্গীত। এদের অভাবে সুর হয় অসুর, তাল হয় বেতাল। সংযমের অভাবে আমাদের কর্মক্ষেত্র হয়েছে অসুর আর বেতালের মল্লভূমি।

হিষ্টিরিয়া রোগটা মেয়েদের পক্ষেই লজ্জাকর। পুরুষের হিষ্টিরিয়া ন্যক্কারজনক। এ দৃশ্যটা আমাদের দেশেই সুলভ। আমরা কীর্ত্তনে সহজেই 'দশা' পাই। সে ভাবাবেগের প্রেরণা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগাই এ কথা যিনি ভাবেন, তাঁকে কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কথায় বলি: 'কাজের বেলা যদি করি if you think, you are an awful goose'. আমাদের ইচ্ছাশক্তিটা স্নায়ুতে এসে থামে, পেশীতে পৌঁছয় না!

গত তিন পুরুষ ধরে আমরা পল্লীর মাটি ও মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক যেমন ত্যাগ করেছি, তেমনি আমাদের অন্তরের ও বাহিরের শূন্যতা ভরে তুলেছি পশ্চিমের বিলাসবাহুল্যের পুঞ্জভারে। তৃণশ্যামল মাটি পুড়িয়ে গ'ড়ে তুলেছি কোঠাবাড়ী, পঞ্চভূতকে লাগিয়েছি পঞ্চেন্দ্রিয়ের পরিচর্যায়। এই জল গ্যাস বিদ্যুৎকে যদি নিজেদের যন্ত্রশক্তিতে বাঁধতে পারতাম তাহ'লে তত ক্ষতি ছিল না। আমরাই পড়েছি তাদের যাঁতাকলে। আমাদের প্রাণপণ শক্তিতে যেটুকু সম্বল পিচকারিতে টেনে তুলি সেটুকু দমকলের জলের মত নিঃশেষে উজাড় করে দিই সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারে। নিজেরা সৃষ্টি করতে পারি না যে সব বিলাসের পণ্যভার সেগুলি সংগ্রহ

করতে চেষ্টা করি বুকের রক্ত জল ক'রে। এমনি ক'রে তিন পুরুষে হয়ে এসেছি ফতুর। একমাত্র উপজীবিকা যেখানে শুধু চাকরী এবং দৈহিক পরিশ্রমের অক্ষমতা ও অপ্রবৃত্তি সেখানে কৃতবিদ্য তরুণ সম্প্রদায়ের মনের অবস্থা কিরূপ হয়ে দাঁড়ায় তা সহজেই অনুমেয়।

রোমান্টিক যুগের আকাশকুসুম আজ হয়েছে সর্ষের ফুল। আশাপ্রবণ মনে জেগেছে সিনিসিজম্ বা সব ঝুঠ্ঠাবাদ। মাঝে মাঝে দেখি দু একটি তরুণ যাদের দেখে কবির সেই গানটি মনে পড়ে:

'রাখিও বল জীবনে, রাখিও চির আশা,
শোভন এই ভুবনে রাখিও ভালবাসা।'

দেশে সব যুগ আসবে এই প্রহ্লাদ-মার্কা ছেলেদের দিয়ে যারা জলে ডোবে না, আগুণে পোড়ে না, অমৎসর, সত্যনিষ্ঠ, কর্মপ্রাণ। গত যুগ ও বর্তমান যুগের ব্যবধানের খাত্‌টি ভ'রে মাঝে মাঝে নামে নানা আন্দোলনের বন্যা। নদীর উপর দিয়ে সাঁকো বাঁধতে হলে জলের তল থেকে পাথরের থাম গেঁথে তুলতে হয়। বড় বড় লোহার চোঙা জলের মধ্যে পুঁতে তার ভিতরকার জল ছেঁচে, সেই লোহার বেড়ের ভিতর নামে স্তম্ভ-নির্ম্মাতা, আস্তে আস্তে গেঁথে তোলে সেতুর ভিত্তিমূল। উত্তেজনার হাত থেকে রক্ষা করতে না পারলে সব চেষ্টা স্রোতের মুখে ভেসে যাবে।

জাতীয় নবজীবনের উদ্যোগপর্ব রইল এই অল্পসংখ্যক

অপ্রমত্ত গুপ্তসাধকদের হাতে। এই তরুণদের কর্মসঙ্গিনী হবেন যাঁরা তাঁদের প্রেমে আসবে বাংলার Neo-romantic যুগ। ঔপন্যাসিক Ibanez এক জায়গায় বলেছেন ঃ An automobile and a necklace are the modern woman's uniform অর্থাৎ একটি মোটরকার ও রত্নহার আধুনিকার বিজয়সজ্জা। ভদ্রসমাজের উচ্চতম স্তর থেকে নিম্নতম তল পর্যন্ত যে বাহুল্যের ঠাট বাঁধা হয়ে যাচ্ছে তাতে এই নারী-প্রগতির দিনে এরূপ প্রলয়ঙ্করী চামুণ্ডামূর্তির আবির্ভাব অসম্ভব নয়। তবে আস্থা আছে, চিররক্ষণশীলা মাতৃপ্রকৃতি বঙ্গনারীর অন্তস্তলে লুপ্ত হয় নি, নবযুগের কার্তিকেয় ভূমিষ্ঠ হবেন শিবানীর ক্রোড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রফুল্ল গৃহলক্ষ্মী হবেন বাংলার ঘরে ঘরে।

বঙ্কিমপ্রসঙ্গ

ছেষট্টি বছর আগে 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় 'পত্র সূচনা' শীর্ষক মুখবন্ধে সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র যে কথাগুলি বলেছিলেন তার থেকে দু একটা উদ্ধৃত ক'রে আপনাদের শোনাই।

"ইংরাজী-প্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থিরজ্ঞান আছে যে, তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাংলা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গলাভাষায় লেখক মাত্রেই হয়ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপি-কৌশল-শূন্য; নয়ত ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদক। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, যাহা কিছু বাঙ্গলা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয়ত অপাঠ্য, নয়ত কোন ইংরাজী গ্রন্থের ছায়ামাত্র; ইংরাজীতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গলায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি?

"আমরা কখনো দেখি নাই যে, যেখানে উভয়পক্ষ ইংরাজীর কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গলায় পত্র লেখা হইয়াছে। আমাদিগের এমনও ভরসা আছে যে, অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদি ইংরাজীতে পঠিত হইবে।

"যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা ভাষায় আপনার উক্তিসকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালির উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।

"এক্ষণে একটা কথা উঠিয়াছে এডুকেশন 'ফিল্‌টার ডাউন' করিবে। এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, কেবল উচ্চশ্রেণীর লোকেরা সুশিক্ষিত হইলেই হইল, অধঃশ্রেণীর লোকদের পৃথক শিখাইবার প্রয়োজন নাই; তাহারা কাজে কাজেই বিদ্বান্ হইয়া উঠিবে। যেমন শোষক পদার্থের উপরিভাগে জলসেক করিলেই নিম্নস্তর পর্য্যন্ত সিক্ত হয়, তেমনি বিদ্যারূপ জল, বাঙ্গালী জাতিরূপ শোষক মৃত্তিকার উপরিস্তরে ঢালিলে, নিম্নস্তরে হঠাৎ ইতর লোক পর্য্যন্ত ভিজিয়া উঠিবে।

"প্রধান কথা এই যে, এক্ষণে আমাদিগের ভিতর উচ্চশ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই। উচ্চশ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা মূর্খ দরিদ্র লোকদের দুঃখে দুঃখিত নহেন। মূর্খ দরিদ্রেরা ধনবান্ এবং কৃতবিদ্যদের কোনো সুখে সুখী নহে। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে সম্প্রতি প্রধান প্রতিবন্ধক। * * * এরূপ কখনো কোনো দেশে হয় নাই, যে ইতর লোক চিরকাল এক অবস্থায় রহিল. ভদ্রলোকদের অবিরত শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। বরং যে যে সমাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে সেই সেই সমাজের উভয় সম্প্রদায় সমকক্ষ, বিমিশ্রিত ও সহৃদয়তাসম্পন্ন।

"প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ণগত পার্থক্য। এই বর্ণগত পার্থক্যের কারণ, উচ্চবর্ণ এবং নীচবর্ণে যেরূপ গুরুতর ভেদ জন্মিয়াছিল, এমন কোনো দেশে জন্মে নাই, এত অনিষ্টও কোনো দেশে হয় নাই।

"যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহৃদয়তা সম্বর্দ্ধিত হয়, আমরা তাহার সাধ্যানুসারে অনুমোদন করিব।"

এই ছেষট্টি বছর ইংরাজি শিক্ষার বিস্তার নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই চলেছে। বি. এ. বঙ্কিমের পরে কত সহস্র বি. এ. বাঙালিতে বাংলা দেশে ছেয়ে গেছে তার গণনা সুসাধ্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সময় শিক্ষিত বাঙালীর মাতৃভাষা সম্বন্ধে যে অনাস্থা বা অবহেলা ছিল তার পরিবর্তন কতখানি হয়েছে সে সম্বন্ধে এইটুকু অসঙ্কোচে বলা যায় 'The little done, the undone vast'. যতটা উন্নতি হওয়া উচিত ছিল তার তুলনায় যতটুকু হয়েছে তা অকিঞ্চিৎকর। এ সম্বন্ধে তথ্য নির্ণয় করতে হলে দুটি জিনিষ মনে রাখতে হবে, quality and quantity, গুণ বা কৌলিন্য এবং পরিমাণ বা সংখ্যা। রবীন্দ্র-সাহিত্যকে বাদ দিলে গত অর্ধ শতাব্দীতে উচ্চাঙ্গের সৎসাহিত্য ঔৎকৃষ্টে ও পরিমাণে বেশী নয়। যথার্থ প্রতিভা-শালী লেখকের সংখ্যা আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে কম। কেন এত কম সেটা ভাববার কথা। বঙ্কিমচন্দ্রের এই শত-বার্ষিকীতে শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেরই তাঁর এই মন্তব্যগুলি স্মরণ করা কর্তব্য।

উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে যে বিষম ব্যবধানের কথা তিনি বলেছেন আজও তা নিরাকৃত হয়নি। একদিকে গণশিক্ষার বিরলতা, অন্যদিকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আর্থিক

স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে অতিরিক্ত পরিমাণে পাশ্চাত্যভাবসম্ভূত সাজ-সজ্জা ও উপকরণবহুল গার্হাস্থ্যাশ্রমের বৈশিষ্ট্যে ধনীদরিদ্রের পার্থক্য বঙ্কিমযুগের চেয়েও বোধ করি এখন আরও প্রবল। আমরা অনেকটা 'ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ' হয়ে পড়েছি, সংস্কৃতির হিসাবে। প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের উপর যে পুনর্গঠনের সূত্রপাত হয়েছে তাতে হিন্দু সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি একদিকে যেমন হারাতে বসেছি, অন্যদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জাগত প্রাণশক্তি, দুঃসাহস, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও সমবায়বুদ্ধি অর্জন করতে পারি নি। বর্ণগত ভেদবিচারের যে অনিষ্টকর বিচ্ছিন্নতার কথা বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেছেন, শিক্ষিত হিন্দু-সমাজের সমবেত চেষ্টায় তার নিরাকরণ কতটুকু হয়েছে ?

বঙ্কিমচন্দ্রের এই শতবার্ষিকীতে আমরা তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে সমবেত হয়েছি। এরূপ অনুষ্ঠানের দায়িত্ব আছে। উচ্চ আদর্শ ও সাধনা তাঁর সাহিত্যিক জীবনকে অনুপ্রাণিত করেছিল। আমাদের শ্রদ্ধার নিবেদন তবেই সত্য হবে, যদি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর কল্যাণব্রতে ব্রতী হবার সঙ্কল্প জাগে। দায়িত্বের গুরুভার যখন বুকের থেকে ঝেড়ে ফেলি, তখন বড় বড় কথা বড় সহজে মুখে আসে। বাক্য-জলজানে স্ফীত ব্যোমযানে চ'ড়ে মেঘলোকে উধাও হওয়া যাদের পেশা তাদের উর্ধ্বগতিকে ক্ষিপ্রতর করবার একটা পদ্ধতি হচ্ছে, বেলুনে বোঝাই করা বালির বস্তা ফেলে ফেলে হাল্কা হওয়া। যে পরিমাণে কথার

অনুযায়ী কাজ করবার বাধ্যতা মন থেকে চলে যায়, সেই অনুপাতে বক্তৃতার মাত্রা বাড়িয়ে চলা সহজ হয়। বঙ্গদর্শনের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র যে শৃঙ্গধ্বনি তুলেছিলেন তার সুগভীর সুগম্ভীর আহ্বান আমাদের কর্মোদ্যমে উদ্বুদ্ধ করুক।

আর একটি কথা বলে আমার বক্তব্য আজ শেষ করব। সেটি হচ্চে সমালোচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা ও আভিজনিন ভদ্রতা। বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় বর্ষের আষাঢ় সংখ্যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বহু বিবাহ' গ্রন্থটির একটি দীর্ঘ সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা। তারানাথ তর্কবাচস্পতির রূঢ় প্রতিবাদে ঈশ্বরচন্দ্রের ধৈর্যচ্যুতি হয়েছিল এবং এই গ্রন্থে ক্রুদ্ধ বিদ্যাসাগরের লেখনীতে কটূক্তি উদ্গীরিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সে ত্রুটি কিরূপ ভদ্রোচিত ভাষায় প্রদর্শন করেছেন, সমালোচনা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রবন্ধটি আদর্শস্বরূপ হয়ে থাকবে। যুক্তি বিচারের নৈপুণ্যেও এ লেখাটি বিশেষ উপভোগ্য। কিন্তু সবচেয়ে যে কথাটি বঙ্কিমচন্দ্র চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, সেটি হচ্চে শিষ্টতা ও শ্লীলতা সর্বদা এবং সর্বথা অলজ্ঘ্যনীয়। সাহিত্যিক বিচারক বঙ্কিম-চন্দ্রের এজলাসে ঋষিতুল্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসংযত বাক্য বিনা কসুরে অব্যাহতি পায় নি। জজের আলখাল্লা উন্মোচন করে বঙ্কিমচন্দ্র এই বলে সমালোচনাটি শেষ করেছেন:

'উপসংহার কালে আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তিনি বিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, দেশহিতৈষী

এবং সুলেখক। ইহা আমরা বিস্মৃত হই নাই। বঙ্গদেশ তাঁহার নিকট অনেক ঋণে বদ্ধ। এ কথা যদি আমরা বিস্মৃত হই, তবে আমরা কৃতঘ্ন। আমরা যাহা লিখিয়াছি তাহা কর্তব্যানুরোধেই লিখিয়াছি।'

'বঙ্কিমপ্রসঙ্গে' রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের সলজ্জ দ্রুত পলায়নের একটি চলচ্চিত্র এঁকেছেন এমন একটি সভাক্ষেত্র হ'তে যেখানে ব্যক্তি বিশেষের কোনো আদিরসাত্মক শ্লোকের আবৃত্তিতে শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সুরসিক ছিলেন, নাসাভ্রূকুঞ্চিতমূর্তি শুচিবায়ুগ্রস্ত রুচিবাগিশ যে ছিলেন না, একথা বলা নিস্প্রয়োজন। কিন্তু প্রকৃত ভদ্রের সহজ সৌজন্য তাঁর ছিল, তাই ইতরতার প্রতি ছিলেন খড়্গহস্ত।

আজকালকার কোনো কোনো সাহিত্যিক আসরে উপস্থিত থাকতে হলে কতবার যে তাঁকে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হত সেই কথাই ভাবি! তাঁর পবিত্র স্মৃতিবাসরে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রটি নিষ্কলুষ নিষ্কণ্টক করবার সঙ্কল্পে বঙ্কিমচন্দ্রের যথার্থ ভক্ত যাঁরা তাঁরা বদ্ধপরিকর হোন।

শ্রীপঞ্চমী

কালিঘাট হিন্দুর একটি পীঠস্থান। আপনাদের এই সমিতির সাহিত্যশাখার সম্পাদক আমার পরমস্নেহাস্পদ প্রভাতকুমার হালদার এখানকার লোকমান্য হালদারগোষ্ঠীর একটি কুলপ্রদীপ। বৃদ্ধের সঙ্গে তরুণের একটি মধুর সখ্যের সম্বন্ধ আছে। সেই সম্পর্কে তিনি আমাকে 'দাদু' বলে ডাকেন। তাঁর সাদর আহ্বানে আজ এই উৎসব সভায় আপনাদের সঙ্গে এই আনন্দের ভোজে বসেছি। একটি প্রবচন আছে

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্ দ্বিজমুচ্যতে।

অর্থাৎ মানুষ মাত্রেই শূদ্রত্বে জন্মলাভ ক'রে সংস্কারের প্রসাদে দ্বিজত্বে উন্নীত হয়। মৌল মানবত্ব হচ্ছে এই শূদ্রত্ব, এই নিম্নস্তরে মানুষে মানুষে বড় পার্থক্য নেই। তারপর মানুষ এই জীবনেই জন্মান্তর লাভ করে সংস্কারের ভিতর দিয়ে। সংস্কার কথাটি বিবিধ কর্মানুষ্ঠানজনিত শুদ্ধি ও বুৎপত্তি অর্থে যেমন ব্যবহৃত হয় তেমনি আবার পূর্বকর্মজ বাসনা ও জ্ঞান যখন অজ্ঞাতসারে স্বাভাবিক মনোবৃত্তিতে পরিণত হয় তখনও তাকে বলি সংস্কার। এই সংস্কার মানুষকে বৈশিষ্ট্য দান করে। আদিম মানব সন্তান তখন আপনাকে অপরাপর থেকে স্বতন্ত্র ক'রে দেখে। এই পার্থক্যবোধে সে যখন দানা বেঁধে

ওঠে তখন স্বগোষ্ঠীর মধ্যেই ভেদবুদ্ধিতে দ্বিজত্বে উপনীত হয়। প্রাণীজগতে মৌলিক সৃষ্টি এমনি করেই বোধ করি পরিস্থিতির প্রভাবের যোগফলটিকে ব্যক্তিত্বের মধ্যে বংশপরম্পরায় রক্ষা ক'রে নানা উদ্ভিজ্জে ও জীবজন্তুতে বিচিত্র হয়ে উঠেছে। এই আপাতবিভেদকে আবার পুনর্মিলিত করতে চায় মানুষের প্রেম। পারিপার্শ্বিকের প্ররোচনায় অধুনা যেখানে স্বাতন্ত্র্য ও সংগ্রাম, আগামীকালে সেখানে দেখি সহযোগ ও পরস্পরের বিভিন্ন সম্পদের বিনিময়। কেন এ কথাগুলি এখানে বলছি সেটা প্রকাশ করেই বলি।

মহাত্মা রামমোহন এই বাংলা দেশে তাঁর সহজাত ও সমকালজাত সংস্কারের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন মানুষের আদিম বর্ণাশ্রমে। প্রতীকোপসনার দেশে প্রবর্তিত করতে চাইলেন তাঁর নবসংস্কারলব্ধ অমূর্ত ব্রহ্মোপাসনা। বাধ্‌ল দ্বন্দ্ব। তিন পুরুষ কেটে গেছে তারপর। আপনারা জানেন আত্মিক সম্পর্কে তিনি আমার পিতামহ, তাই নিজেকে ব্রাহ্ম নামে অভিহিত করি। সত্যের স্ববিরোধী নানারূপ আমাদের অপূর্ণ দৃষ্টিতে। একটি সত্যের আপাত দৈন্যের বিরুদ্ধে জাগে প্রতিবাদাত্মক সত্যের ঘোষণা। কিন্তু তারও থাকে সঙ্কীর্ণতার খণ্ডতার ক্ষুদ্রতা, আমাদের অদূরদর্শী দর্শনের চৌহদ্দির মধ্যে। শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব নিয়ে একটি উদ্ভট শ্লোক মনে আসছে।

"উভয়ো প্রকৃতিস্ত্বেকা প্রত্যয়ভেদাদ্ বিভিন্নবদ্ভাতি।
কলয়তি কশ্চিন্মূঢ়ো হরিহরভেদং বিনা শাস্ত্রম্॥

হৃ ধাতু বা প্রকৃতির থেকেই বিভিন্ন প্রত্যয়ে হরি ও হর এই ছুটি শব্দ ব্যুৎপন্ন হয়েছে। উভয়ের প্রকৃতিগত অভিন্নতা ভুলে গিয়ে প্রত্যয়বিকল্পে অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে বৈষ্ণব-শাক্তে বাধে যুদ্ধ। আজ যেখানে সংগ্রাম, কাল সেখানে সন্ধি। ছুটি বিরুদ্ধ মতের সমন্বয় আনে উত্তরকাল। আজ আমাদের দেশে এই সমন্বয়ের যুগ এসেছে, যুক্তিতর্কের ব্যর্থ আস্ফালনের মধ্যে নয়, প্রেমের মৈত্রী বন্ধনে বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধা ক'রে। আমরা সকলেই ত্রিলোচন। আমাদের তৃতীয় নেত্রটি যখন নিমীলিত থাকে তখন পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যকেই বড় ক'রে দেখি। যখন সে চক্ষু উন্মীলিত হয়, তখন সুস্পষ্ট হয় আমাদের অন্তর্জ্জাতৃত্ব। তখন আমরা মিলিতকণ্ঠে গেয়ে উঠি:

'মিলেছি আজ মায়ের ডাকে
ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে ?'

বাংলার জাতীয় মন্ত্রের উদ্গাতা বঙ্কিমচন্দ্রকে মূলগায়েন ক'রে আসুন আমরা সমস্বরে একবার গাই:

ত্বংহি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং।

নেশা জিনিষটার আরম্ভ হয় সঙ্গোপনে। তারপর সেটা যখন পাকে তখন আর লজ্জা সঙ্কোচ থাকে না। আশৈশব

কবি ও কাব্যের ভক্ত ছিলাম। কিন্তু আমার সে ভক্তিটা ছিল পর্দানশীন। ডেঁপো ছেলের 'বার্ডসাই' খাওয়ার মত কাব্য-চর্চাটা গোপনেই একটু আধটু চলত। কিন্তু প্রকাশ্যে কুল্‌কুচো করেই বাহির হতাম, যাতে তার কোনো গন্ধ না থাকে। বুড়ো বয়সে লজ্জার প্রকোপ কমে, বৃদ্ধারও গুণ্ঠন খসে। আমার এই বার্ধক্যকে যারা আনন্দময় ক'রে তুলেছে তাদের কাছে আমার কোনো লজ্জা নেই। তাই আজ অসঙ্কোচে আপনাদের আসরে এমন স্থানটিতে কম্পিতপদে এসে বসলাম যেখান থেকে সভাস্থ কারুর দৃষ্টি এড়ানো আর সম্ভবপর নয়।

গত পঞ্চাশ বৎসরে সরস্বতী মূর্তির স্থাপত্যে যে অপূর্ব পরিবর্তন এসেছে, ইউরোপ হ'লে এর ক্রমবিবর্তনের ধারা-বাহিক চিত্রাবলী অঙ্কিত দেখতে পেতাম ছবির বইয়ের পাতায় পাতায়। মানসী প্রতিমাকে রূপ দেন শিল্পী। শিল্পীর মনে সমসাময়িক প্রভাব তার ছায়াঙ্কপাত করে। তার নিদর্শন আজ আমরা লক্ষ্য করছি বিচিত্র দেবীপ্রতিমার নব্য রূপায়ণে। কবিতায় বিগত এক শতাব্দীর মধ্যে কি পরিবর্তন ঘটেছে তার প্রতিলিপি ত আমাদের ঘরে ঘরেই আছে। সম্প্রতি কাব্য-লক্ষ্মীর যে রূপান্তর দেখছি সেটা সকৌতুকে লক্ষ্য করবার জিনিষ। বাঁধভাঙা বন্যাজলের মত পাশ্চাত্য ভাব ও চিন্তা আমাদের মনের আনাচে কানাচে ঢুকেছে। তার ফলে এক-শ্রেণীর কবিতার আবির্ভাব হয়েছে যেটা ভাবে ও ভাষায়

পশ্চিমের ব্যঙ্গানুকৃতি মাত্র। স্বীকরণ ও অনুকরণে একটা প্রভেদ আছে। কাব্য বিশ্বভারতীয়। কিন্তু তার প্রকাশ জাতীয় অভিজ্ঞতা অনুভূতি ও রুচিকে আশ্রয় না ক'রে যদি ফুটে ওঠে তবে আমাদের এই হ্যাট্‌কোটের প্রসাধনের মত নিতান্ত বেখাপ্পা হয়ে দাঁড়াবে। খাদ্যটা পরিপাক লাভ করলে দেহের রসরক্তে পরিণত হয়ে আমাদের স্বাস্থ্যে, শক্তিতে ও মুখশ্রীতে প্রকটিত হয়। অন্যথা অজীর্ণ উদ্‌গারে উদরস্থ আহারটা ভুক্তবিকারের একটা দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে। যা বলি যা লিখি সেটা যে উপলব্ধিগত আত্মোক্তি নয় এরূপ লক্ষণ উৎ-পাদন করে কর্ণপীড়া। তাই মনে পড়ে গ্যেটের সেই সাবধানী বাণী তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশে : অন্তর্গূঢ় অনুভূতি ও জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে যা লাভ করনি, সেটা পরের কথার ছন্দানুবর্তী হয়ে বলতে চেষ্টা কোরো না। কাব্যলক্ষ্মীর দুর্গতির কথা স্মরণ ক'রে এক কবি বলেছিলেন :

'বাল্মীকেরজনি প্রকাশিতগুণা ব্যাসেন লীলাবতী
বৈদর্ভী কবিতা স্বয়ং বৃতবতী শ্রীকালিদাসং বরং।
যাস্থূতামরসিংহশঙ্কুধনিকান্ সেয়ং জরানীরসা
শূন্যালঙ্করণা স্খলন্ মৃদুপদা কংবা জনং নাশ্রিতা॥'

আদি কবি বাল্মীকির ললাটিকা তনয়া তুমি যে।
শৈশবের খেলাঘরে ব্যাসের ক্রীড়ার সহচরী,
বিকচ যৌবনে কবি কালিদাসে মাল্য দিলে নিজে।

যে তুমি অমরসিংহ শঙ্কুধনিকেরে কোলে করি
লভেছিলে মাতৃমূর্তি, সেই তুমি জরায় নীরসা
অলঙ্কারহীনা এবে। মৃদুপদে চলিতে চলিতে
পতনে উন্মুখা হও বারংবার, হেন দীনদশা।
যারে পাও ধর তুমি তারি হাত নিজেরে রক্ষিতে।

আত্মপ্রকাশের একটা সাঙ্কেতিক উপায় হচ্ছে ভাষা। এই ভাষাকে বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে পরিপূর্ণ ক'রে তুলেছে কেবল মানুষ। জীবজগতে কণ্ঠধ্বনির ব্যবহার আছে ভাব ব্যক্ত করবার জন্যে, কিন্তু সে কেবল শব্দের টুক্‌রা মাত্র। ভাষার এই ধারাবাহিক ব্যঞ্জনা ফুটেছে কেবল মানুষের মুখে। শুধু তাই নয়, বাক্যের নিহিতার্থকে আরো স্পষ্টতর করবার জন্যে উদ্ভাবিত হয়েছে ছন্দ এবং সুর। সোজা কথায় প্রতিদিনের আটপৌরে ব্যবহার চলে। কিন্তু সূক্ষ্মতম অনুভূতি ও ভাবকে প্রকাশ করবার জন্যে মানুষের উদ্‌ভাবনী শক্তি আবিষ্কার করেছে ছন্দোবদ্ধ কবিতা ও তানলয়সম্বলিত সঙ্গীত। জড় জগতের অন্তরালে মানুষের সন্ধানী চক্ষু বিশ্বস্রষ্টাকে অন্বেষণ করেছে। ভারতের প্রাচীন ঋষি জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যে দেবতাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁকেই আবার অন্তরে উপলব্ধি ক'রে বলেছেন

'তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।'

অর্থাৎ ধীর ব্যক্তি বিশিষ্ট জ্ঞানময় দৃষ্টিতে জ্ঞানময় দেবতাকে আনন্দময় অমৃতময় ব'লে দেখেন। কলাকুশলী কবি ও শিল্পী

অমূর্তকে আকার দান করেন রূপকশ্রীতে। এই কাব্য ও সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর 'বীণাপুস্তকরঞ্জিতহস্তা' মূর্তি কল্পনা করেছে ভক্তের ধ্যানদৃষ্টি! এই মাতৃমূর্তিকে স্মরণ ক'রে এক প্রাচীন কবি বলেছেন :

সঙ্গীতং কাব্যশাস্ত্রঞ্চ সরস্বত্যা স্তনদ্বয়ম্।

বাগ্‌দেবীর একটি স্তন সঙ্গীত, অপরটি কাব্যশাস্ত্র—উভয়েই অমৃতধারা দান করে সন্তানের মুখে।

একটা কথা ব'লে আমার বক্তব্য শেষ করি। গত এক শ বৎসরের মধ্যে বাংলা ভাষার উন্নতি বিস্ময়কর। কিন্তু এখনো আমাদের এই মাতৃভাষার অনেক দৈন্য আছে। চল্‌তি ভাষা প্রাণের আবেগে আপনার পথ কেটে চলবে। তার মধ্যে চাই প্রাণের খোরাক যা অপর্যাপ্ত পরিমাণে আসছে পাশ্চাত্য দেশ থেকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে আমাদের যোগ যেন সে অনুপাতে দিন দিন বিচ্ছিন্ন হয়েই আসছে। প্রাচীনকে রূপান্তরিত ক'রেই নবীনের উদ্ভব, তাকে বাদ দিয়ে নয়। আজকাল পশ্চিমে classicsএর বিরুদ্ধে একদল মুখর হয়ে উঠেছেন। সেই খেই ধরে আমরাও কেউ কেউ সংস্কৃতকে কোণ্‌ঠাসা করবার চেষ্টায় আছি। এতে কেবল যে আমাদের ভাষার পরিপুষ্টি দৈন্য লাভ করবে শুধু তাই নয়, আর্য সংস্কৃতির মূল সম্পদগুলির থেকেও আমরা ক্রমশঃ বঞ্চিত হব। বাংলা অনুবাদের সাহায্যে সংস্কৃত পুঁথিতে প্রবেশ লাভ করতে হলেও

দেবভাষার সঙ্গে কতকটা পরিচয় থাকার প্রয়োজন। তদভাবে সংস্কৃত ভাষা আমাদের কাছে ল্যাটিন গ্রীকের মতই দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে এবং সেই সঙ্গে প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের যোগসূত্রটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। জাতীয় জীবনের পক্ষে এটা মারাত্মক বিপত্তি। এ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক না হলে আর দুপুরুষেই আমরা প্রাচ্য সংস্কৃতির উৎসমূল হারাতে বসব। আজ এই বাণীপূজার দিনে দেবীপ্রতিমার পুঁথিটির দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সে গ্রন্থ দেবভাষায় লিখিত, ইংরেজিতে নয়। তার উপর পাশ্চাত্য পুস্তকের স্তূপ যদি চাপান ক্ষতি নেই। সেটা হবে পাথরে পাঁচ কিল, পাকা বনেদের উপর বিশ্বভারতীয় মন্দির।

নিসর্গ চক্ষুচিকিৎসক। জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া অস্ত্রোপচারে চোখের মতিয়াবিন্দুটি উৎপাটিত করেন। চশ্‌মা নাকে এঁটে সংসারটাকে আবার নতুন চোখে দেখতে শিখি। এই কৃত্রিম আনুকূল্যে যে দৃষ্টিটা অন্তিমে আমাদের চোখে ফোটে, আগামী যুগে সেইটেই সহজ দৃষ্টি হ'য়ে উত্তরকালের তরুণদের চোখের আলো হয়। প্রান্তিকযুগ স্বনির্বাচিত উত্তরাধিকারীকে আপনার গদিতে বসিয়ে তবে অবসর গ্রহণ করে। অস্তোন্মুখী যুগান্ত যে কুঙ্কুমরঞ্জনা পশ্চিমাকাশে মাখিয়ে যায় সেই অরুণ-রাগই ফুটে ওঠে পূর্বাশার উদয়াচলে। অতীত ও ভবিষ্যের গাঁঠ্‌ছড়া বাঁধা পড়ে এই অধুনার রক্তাম্বরে।

ফুটবল খেলায় পিছনের খেলুড়ে বল্‌টাকে সম্মুখের ঘাঁটি-দারের পায়ের কাছে গড়িয়ে দেয়। তার অগ্রসারিণী গতিকে ক্রমপরম্পরায় গোলের লক্ষ্যমুখে প্রধাবিত ক'রে। জাতীয় জীবনে বিবর্তনের এই অগ্রগতিতে সম্মুখপশ্চাতের ঐক্যবন্ধন এইরূপ প্রাচীন ও নবীনের সহযোগিতায় সম্ভবপর হয়।

যাদৃশী ভাবনা যস্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

আমাদের অন্তর্গূঢ় ভাবনাটি কি, তার উপর নির্ভর করবে এই সারস্বত সম্মিলনের সার্থকতা।

রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়'

চতুর্দশবর্ষীয় বালক রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কবিকাহিনী'তে এই লাইনটি লিখেছিলেন ঃ

'নিশাই কবিতা আর দিবাই বিজ্ঞান।'

ব্যাখ্যার ছলে বলেছেন ঃ দিবালোকে সবই সুস্পষ্ট, বিশ্লিষ্ট, ফুলের প্রত্যেক কাঁটাটি চোখে পড়ে, মনে হয়

'নিয়মের লৌহচক্র ঘুরিছে ঘর্ঘরি।'

কিন্তু রাত্রির রহস্যঘন অন্ধকারে এই দৃশ্যজগৎ যেন রূপান্তর লাভ করে স্বপ্নচ্ছবিতে। নিশাদেবী তারার পুষ্পহার মাথায় জড়িয়ে বিশ্বের পাতায় পাতায় লেখেন কবিতা।

একই জিনিষকে দুই দিক থেকে দেখা যায়। একটা বিচার-বিশ্লেষণের দিক, আর একটা কল্পনা-অনুভূতির গহন বিপুল রসার্ণবের উদার বিস্তৃতিতে আত্মহারা। বিজ্ঞানও কল্পনা এবং সীমাতীতের নর্মভূমি। কিন্তু সে কল্পনার ভিত্তি প্রত্যক্ষের বিচারমূলক সিদ্ধান্তের উপরে। তার অসীমতা অনুভূতির সান্দ্ররসে নয়, সীমার পরিধিকে গাণিতিক গবেষণার ভূমায় প্রসারিত ক'রে। কাব্য ও বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু এক— জড়জীবময় এই জগৎ, কিন্তু প্রেক্ষাভূমি স্বতন্ত্র, দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যে ভিন্নপথাবলম্বী। বিজ্ঞান যে খনিজ সত্য আবিষ্কার

করে, কবি তাকে করেন রসঘন এবং সুন্দর। বিজ্ঞানী কবির বড় একটা তোয়াক্কা রাখেন না, কিন্তু কবির মহাজন বৈজ্ঞানিক, যাঁর অ।।বষ্কারের আনুকূল্যে ও মালমশলায় কবির সৃজনলীলা ঋদ্ধিমতী হয়। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের তত্ত্ব ও তথ্য কবির বিচিত্র রচনার উপকরণ। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক ও বস্তুগুণ-সন্ধানী চিত্ত বিজ্ঞানের মূল সত্যগুলির প্রতি আশৈশব কিরূপ আগ্রহান্বিত ছিল, তার কিঞ্চিৎ আভাস 'বিশ্বপরিচয়ে'র ভূমিকায় আমাদের দিয়েছেন।

সর্বতোমুখী প্রতিভারও বিশেষ প্রবণতা থাকে কোন একটি বিধিনির্দিষ্ট দিকে। সেই আপেক্ষিক গুরুতর আকর্ষণের টানে রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক না হয়ে হলেন কবি। কিন্তু তাঁর সারা জীবনব্যাপী সাধনার মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় তাঁর কবিতায় গল্পে প্রবন্ধাদিতে সর্বত্রই পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে সীমার মধ্যে সীমাতীতের কবি। পরিধিহীন দেশ ও নিরবধি কালকে ক্রমাপসারিণী তটভূমিতে উত্তীর্ণ করেছে জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতশাস্ত্র। বহুর মধ্যে একত্বকে প্রতিপন্ন করেছে বিজ্ঞানীর পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি। এই সব তথ্য কবির সূক্ষ্মানুভূতিকে অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি দান করেছে। তাই তিনি রূপ থেকে অপরূপের ও অরূপের সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং তাঁর অমৃতময় রচনায় সে অভিজ্ঞতা আমাদের জন্যে লিপিবদ্ধ করেছেন। বিজ্ঞানীর দিদৃক্ষা তার স্থূল চক্ষুর দৃষ্টিকে সুদূর-

গামিনী করেছে দূরবীক্ষণ আবিষ্কার ক'রে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দর্শন লাভ করেছে অণুবীক্ষণ রচনা ক'রে, স্পেকট্রস্কোপ বা বর্ণ-বিশ্লেষিকা যন্ত্রের উদ্ভাবনা ক'রে সুদূর নক্ষত্রের রাসায়নিক উপাদানের তথ্য সংগ্রহ করেছে, তার গতিবেগের পরিমাপ নির্দ্ধারণ করেছে সেই মাপকাঠিতে যার এক একটি দাগের দৈর্ঘ্য বলা যেতে পারে কোটিগুণ কোটিরও অধিক! তাই কবি বলেছেন: 'প্রকাশ লোকের অন্তরে আছে যে অপ্রকাশ লোক, মানুষ সেই গহনে প্রবেশ ক'রে বিশ্বব্যাপারের মূল রহস্য কেবলি অবারিত করছে।' এই যবনিকার পর যবনিকার উন্মোচন ত কাল্পনিক নয়, প্রত্যক্ষসিদ্ধ পরীক্ষা ও গণনার অঙ্কফল। বিজ্ঞানের আনন্দ তাঁর লেখনীর স্পর্শে সান্দ্ররসে ঘনীভূত হয়েছে। প্রেমের একটা নিত্য লক্ষণ জিজ্ঞাসা। এই প্রশ্নোত্তরের মালায় বিজ্ঞানী বরণ করেন বিজ্ঞানলক্ষ্মীকে। কবির স্পর্শে সে রত্নমালিকা হয় অম্লাননবীন পুষ্পহার।

পাশ্চাত্য দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সরল সিদ্ধান্তগুলি সাধারণ পাঠকদের নিকট সুপরিচিত হয়েছে বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীদের রচিত সহজপাঠ্য প্রবন্ধ ও পুস্তকাবলীতে। বিজ্ঞানের গূঢ়তত্ত্বগুলি জনসাধারণের কাছে প্রচারিত হওয়ায় এক দিকে যেমন বিজ্ঞানসাধনায় প্রবর্তনা এনেছে, সেই সঙ্গে আবার এই সকল সত্যের বহুল প্রচার সাহিত্য শিল্পকলা ও যন্ত্রসম্পদকে সমৃদ্ধ করেছে। যে সকল কথা এক দিন ছিল বিশেষবিৎ পণ্ডিতদের পুঁথিপত্রের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ

তারা অল্পাধিক পরিমাণে সকলেরই চিন্তা ও ধারণার বিষয়ীভূত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রাক্-পরমাণু লোক থেকে আরম্ভ ক'রে বিশাল বিপুল নাক্ষত্র জগতের ক্রমবিবর্ধমান চক্রবাল পর্যন্ত পাঠকের বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছেন।

বলা বাহুল্য বইখানি জড়বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ নয়। অথচ এতে আছে বিশ্বসৃষ্টির বর্ণপরিচয় থেকে আরম্ভ ক'রে পর্যায়-ক্রমে নক্ষত্রলোক, সৌরজগৎ, গ্রহলোক ও ভূলোকের কথা। একদা আমরা বিজ্ঞানের কাছে শুনেছিলাম যে, যে অক্ষরগুলিতে এই বিপুল বিশ্বগ্রন্থ রচিত হয়েছে তার ছাপাখানার হরফগুলি স্বতন্ত্র বিভক্ত করলে বিরানব্বইটি মৌলিক পরমাণুর খোপে খোপে তাদের ফেলা যায়। এই মূল কণাগুলির রসায়নিক যোজনায় বিচিত্র পদার্থের উদ্ভব। পুরাতন রসায়নশাস্ত্র বাতিল হয়ে যায় নি। কিন্তু এই মূল অক্ষরের উপাদানগুলি যে জড়ের চরম অণু নয়, তারা যে প্রত্যেকটি আবার প্রাগাণবিক বৈদ্যুতিক মিথুনের জটলা, রূপকথার মতই কবি জড়তত্ত্বের সেই অতিনিগূঢ় রহস্যের বার্তা আমাদের শুনিয়েছেন। নানা চমৎকার উপমা ও দৃষ্টান্তের আনুকূল্যে তাঁর অপূর্ব বর্ণনা অতি উপাদেয় হয়েছে। যাকে চোখে দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, তার অস্তিত্বের প্রমাণ স্বপ্নকল্পনার তুরীয় লোকে নয়; লেবরেটরীতে পরখ ক'রে দেখবার যন্ত্রের সাহায্যে রফা হয়েছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে আছে গণিত শাস্ত্রের সেই অকাট্য যুক্তি, যা ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরিয়েছে মানুষের

বিচারনিষ্ঠ বুদ্ধির অনপনেয় সিদ্ধান্তে। আদালতের চূড়ান্ত নৈয়ায়িক নিষ্পত্তির চেয়ে এই সব বিজ্ঞানীর রায় বেশী ছাড়া কম প্রামাণ্য নয়। তথাচ এইখানেই ইতি নয়। বিজ্ঞানের এই নেতিত্বের মধ্যেই ত রয়েছে মানবপ্রতিভার ক্রমাভিসারিণী অগ্রগতির প্রেরণা।

'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে।'

মণিমুক্তা দিয়ে শিল্পী যেমন একটি কারুচিত্র নিখচিত করে, বহু বৈজ্ঞানিক তথ্যরত্নের সমাহারে কবি তেমনি এক শত পৃষ্ঠার মধ্যে নিখিল বিশ্বের একটি অপরূপ আলেখ্য আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলেছেন। নব বিজ্ঞানের গীতার এই পুস্তিকাটি যেন 'বিশ্বরূপদর্শন যোগে'র মহিমময় একটি অধ্যায়। কবি আমাদের আহ্বান ক'রে বলছেন:

'ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।'

আমরাও এই বিশ্বরূপকে নমস্কার ক'রে বলি,

কিরিটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তং
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্॥

এই 'দীপ্তানলার্কদ্যুতি'কেই লক্ষ্য করে উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ বলছেন:

'আমরা জড়বিশ্বের সঙ্গে মনোবিশ্বের মূলগত ঐক্য কল্পনা করতে পারি সর্বব্যাপী তেজ বা জ্যোতিঃ পদার্থের মধ্যে।

অনেককাল পরে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে আপাতদৃষ্টিতে যে সকল স্থূল পদার্থ জ্যোতির্হীন তাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আকারে নিত্যই জ্যোতির ক্রিয়া চলছে। এই মহাজ্যোতিরই সূক্ষ্ম বিকাশ প্রাণে এবং আরও সূক্ষ্মতম বিকাশ চৈতন্যে ও মনে। বিশ্বসৃষ্টির আদিতে মহাজ্যোতি ছাড়া আর কিছুই যখন পাওয়া যায় না তখন বলা যেতে পারে চৈতন্যে তারই প্রকাশ জড় থেকে জীবে একে একে পর্দা উঠে মানুষের মধ্যে এই মহা চৈতন্যের আবরণ ঘোচাবার সাধনা চলেছে। চৈতন্যের এই মুক্তির অভিব্যক্তিই বোধ করি সৃষ্টির শেষ পরিণাম।' (দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ১০৩-১০৪)

রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়' কেবল মাত্র জীন্স, এডিংটন প্রভৃতি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের তথ্যানুবৃত্তি নয়। বর্তমান সময়ে রবীন্দ্রনাথের চিত্ত ইউরোপীয় ও ভারতীয় সংস্কৃতির একটি মহামিলনক্ষেত্র। বিজ্ঞানের যে দীপিকা পশ্চিমের দিগ্‌বধূর হাতে বিধৃত, তার কিরণে আজ পূর্বপশ্চিম যুগপৎ আলোকিত। এই তীব্র আলোকে অনেক যুক্তিভিত্তিহীন সংস্কার নির্বিচারে রক্ষিত আবহমান কালের গতানুগতিক মতবাদ অন্তঃসারশূন্য বলে প্রতিপন্ন হয়ে যাচ্ছে, কি প্রাচ্যে কি প্রতীচ্যে। সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষালব্ধ সত্যগুলি উত্তরোত্তর লাভ করছে অভিনব মূল্য ও মর্যাদা। আমাদের অন্তরে মধ্যযুগীয় বা পৌরাণিক আদর্শের সঙ্গে নবযুগের বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার অহরহ দ্বন্দ্ব। এই ঘাত-

প্রতিঘাতের সমন্বয় সাধনে যাঁরা যত্নবান আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অগ্রণী। তাঁর mystical বা অধ্যাত্ম পরিপ্রেক্ষা উদ্‌ভাসিত হ'য়ে উঠেছে ratioalistic বা যুক্তিস্ফুরণোজ্জ্বল বস্তুতান্ত্রিক পর্যবেক্ষণে। এই আপাতবিরুদ্ধ দ্বৈতাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীর স্নিগ্ধবিলোকন ফুটেছে রবীন্দ্রনাথের ললাটিক তৃতীয় নেত্রে। এই সুদূরগামিনী দৃষ্টি নব্যভারতের প্রত্যুষে এক দিন ফুটেছিল রামমোহনের নয়নে। তাই তিনি আমাদের জাতীয় শিক্ষাবিভাগে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও গণিত চর্চার উদ্বোধন ভিক্ষা করেছিলেন রাজদ্বারে। রবীন্দ্রনাথও 'বিশ্বপরিচয়ে'র ভূমিকায় বলেছেন ঃ

'যারা এই (বৈজ্ঞানিক) সাধনার শক্তি ও দান থেকে একেবারেই বঞ্চিত হ'ল তারা আধুনিক যুগের প্রত্যন্ত দেশে একঘরে হয়ে রইল।'

প্রাচ্য সংস্কৃতির পাঞ্চজন্যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ফুৎকার কি গম্ভীর স্বরে উদ্গীরিত হয় তার স্বরলিপি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটিতে আছে।

কঠিন দুর্বোধ্য বিষয় রসাত্মক প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত হলেও বিশেষ প্রণিধাণের সঙ্গে পড়তে হয়। বিজ্ঞানের সঙ্গে যাঁদের কোন পূর্বপরিচয় নেই, স্থানে স্থানে তাঁদের হয়ত পূর্ণ উপভোগে বাধা পড়বে। এইজন্যে বইখানি একাধিকবার পড়তে অনুরোধ করি। অস্পষ্ট আবছায়াগুলো যদি সুস্পষ্ট প্রশ্নের আকার ধারণ করে তাহলেই পাঠ সার্থক হবে। এই

জিজ্ঞাসাই জ্ঞাতব্য তথ্যসন্ধানের পথপ্রদর্শক। বিশ্বসৃষ্টিকে যদি বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি দিয়ে দেখবার শক্তি অর্জন না করি তবে বর্তমান যুগে আমরা অন্ধ হয়েই থাকব। আমাদের চোখের ছানি কাটাবার যাদুমন্ত্র এই বইটিতে আছে।

রুদ্ধ ঘরের বদ্ধ হাওয়ার থেকে উদার উন্মুক্তির ভিতর একবার দাঁড়ালেও বুঝি মনের সঙ্কীর্ণতা দূর হয়। এত বড় বিশ্বে এই পৃথিবীটা যে ধূলিকণার চেয়েও ক্ষুদ্রাণু, ক্ষণকালের জন্যেও এ অনুভূতিতে অভিমান অহংকার ধুয়ে মুছে যায় এবং সেই সঙ্গে অন্তরে জাগে মানবজন্মের আভিজাত্যের নিরভিমান আত্মগৌরব। কী সুন্দর ক'রেই কবি এই কথা আমাদের বলেছেন! উদ্ধৃত করবার প্রলোভন সম্বরণ করতে পারলাম না।

'নাক্ষত্র জগতের দেশকাল পরিমাপ গতিবেগ দূরত্ব ও তার অগ্নি-আবর্তের চিন্তনাতীত প্রচণ্ডতা দেখে যতই বিস্ময় বোধ করি এ কথা মানতে হবে বিশ্বে সব চেয়ে বড় আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মানুষ তাদের জেনেছে, এবং নিজের আশু জীবিকার প্রয়োজন অতিক্রম করে তাদের জানতে চাচ্ছে। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ক্ষণভঙ্গুর তার দেহ, বিশ্ব ইতিহাসের কণামাত্র সময়টুকুতে সে বর্তমান, বিরাট বিশ্ব-সংস্থিতির অণুমাত্র স্থানে তার অবস্থান অথচ অসীমের কাছঘেঁষা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুষ্পরিমেয় বৃহৎ ও দুরধিগম্য সূক্ষ্মের হিসাব সে রাখছে—এর চেয়ে আশ্চর্য মহিমা বিশ্বে আর কিছুই নেই, কিংবা বিপুল সৃষ্টিতে নিরবধি

কালে কি জানি আর কোনো লোকে আর কোনো চিত্তকে অধিকার ক'রে আর কোনো ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে কি না। কিন্তু একথা মানুষ প্রমাণ করেছে যে, ভূমা বাহিরের আয়তনে নয়, পরিমাণে নয়, আন্তরিক পরিপূর্ণতায়।' (দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ৫৮)

শান্তিনিকেতনের স্মৃতি

শান্তিনিকেতনের শিক্ষায়তনের সঙ্গে আমার অনেক দিনের নাড়ীর টান আছে। ১৯০৩ সনের কথা বলছি। তখন এখানে এসেছিলাম এক গ্রীষ্মের ছুটিতে, আমার হাতের তৈরি (অর্থাৎ মিস্ত্রির হাত আর আমার বাৎলানো) বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিয়ে, সেই ছুটির সময় সখের মাস্টারি করতে। তখন সরকারী অধ্যাপকের পদে বাহাল হইনি। এই খানেই হয় আমার অধ্যাপনার হাতেখড়ি। তখন আমি নববিবাহিত, সস্ত্রীক এই আশ্রমের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম। গুরুদেবের সঙ্গে নিকটতর পরিচয় লাভ করবার সৌভাগ্য হয়েছিল সেই প্রথম। কিন্তু মাত্র দু-দিনের জন্যে। কন্যার রোগবৃদ্ধির দুঃসংবাদ পেয়ে তিনি আলমোড়া পাহাড়ে চলে গেলেন। কিন্তু সেই দু-দিনের স্মৃতি অমর হয়ে আছে। প্রথম দিন সন্ধ্যার পর আমাদের ঘরে এসে তাঁর 'বিনি-পয়সায় ভোজ' শীর্ষক রচনাটি আবৃত্তি ক'রে একটা হাসির ঢেউ তুলে দিয়ে গেলেন।

শান্তিনিকেতনের পুরানো বড়কুঠির অদূরে, কবির সদ্যঃ-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সেই নবোদ্ভিন্ন রূপটি মনে পড়ে।

খোলার চালে আর মাটির দেওয়ালে তৈরি ছোট ছোট ঘরের লাইনবন্দী একটি লম্বা কুটীর। সামনে মাটির দাবা।

তার পাশে ছিল একটি একতলা পাকা বাড়ী, কতকটা সরকারী ডাকবাংলার মত। তিনখানি ঘর পাশাপাশি, মাঝের ঘরটা বড়। সামনে ধূ ধূ করছে কাঁকর-ভরা খোলা মাঠ। বাড়ীর এক পাশে ছিল একটা বেঁটে ত্রিভঙ্গ খেজুর গাছ। সেই বাড়ী এখন দ্বিতল লাইব্রেরি গৃহে পরিণতি লাভ করেছে। মাঝের ঘরটি ছিল আমাদের বিজ্ঞানাগার, বাঁ-দিকের ঘরটা হ'ল আমাদের আস্তানা, আর ডানদিকের ঘরটিতে মাদুর পাতা। দুপুরে সে ঘরে আমাদের সাহিত্যিক মজ্‌লিশ বসত।

সকালবেলা ঐ মাঝখানের বড় ঘরটিতে চলত আমাদের বিজ্ঞানচর্চা। ফিজিক্স আর কেমিষ্ট্রির ছোটখাটো পরীক্ষা, আর সেই সঙ্গে তাদের ব্যাখ্যা; কতকটা কিণ্ডারগার্টেনের মত। কূয়োতলায় হ'ত স্নান, জল তুলে দিতেন ছাত্ররা। তাঁদের মধ্যে যতীন গুপ্তের কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়ে।

দুপুরবেলা অসহ্য গরম। ডানদিকের ঘরে বসত আমাদের বৈঠক। একটা খসখসের পর্দা ছিল দরজায় ঝুলানো। বালতিতে থাকত জল, শ্রীমান যতীন্দ্র এবং আমরাও মাঝে মাঝে পিচকারি নিয়ে পর্দার সঙ্গে বিনা আবীরে হোলি খেলে আসতাম। বৈঠকে চলত পাঠ, কাব্যালোচনা ও গল্প। সেক্সপীয়রের তিনখানি নাটক—কীং লীয়র, সিম্বেলিন ও ম্যাক্‌বেথ পড়া হয়ে গেল মাসখানেকের মধ্যে, কতক বোঝা কতক না-বোঝার ভিতর দিয়ে। আমাদের প্রধান পাঠক

ছিলেন আশ্রমের শিক্ষক সতীশচন্দ্র রায় ও অজিতকুমার চক্রবর্তী। সেক্সপীয়র ছাড়া আমাদের কবির ও ইংরেজী কবিতার আবৃত্তি চলত। সতীশের মুখে রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ' ও ম্যাথু আর্নল্ডের 'সোহ্‌রাব রোস্তম' আবৃত্তির অনুরণন এখনও আমার মনে জেগে ওঠে।

গলদ্‌ঘর্ম দেহে দুপুর থেকে বিকাল পর্যন্ত কী রকম উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে দ্রুতবেগে কাব্যচর্চা চলত, তা এক মাসের পাঠসূচীর পরিমাণ থেকে অনুমান করা যেতে পারে। এরই মধ্যে পঠিত অংশের বিষয়বস্তু নিয়ে বিচার-বিতর্ক টীকাটিপ্পনীও চলত। অধিকাংশই কিশোরবয়স্ক, কিন্তু উৎসাহ-উদ্দীপনায় গুরুশিষ্য সকলেই সমপ্রাণ। এই আসরের প্রাণস্বরূপ ছিলেন সতীশচন্দ্র ও তস্য সহযোগী অজিতকুমার। একটা কথা সর্বদাই মনে হয়, দুইয়ে দুইয়ে চার হয় আঙুল গুণে, কিন্তু দু-চার জন সহধর্মী প্রাণের অন্তরঙ্গ সহযোগের যোগফল উত্তীর্ণ হ'তে পারে সংখ্যাতীতে।

সকালবেলা আমি ছিলাম বিজ্ঞানের উপাধ্যায় এবং দুপুরবেলা কাব্যালোচনায় ছেলেদের সতীর্থ। রোদ পড়ে এলেই আমরা দল বেঁধে বাহির হতাম মাঠে। প্রায় প্রত্যহই সেই সময়ে দেখা দিত বৈশাখী ঝড়। আমরা খালিপায়ে কোঁচার কাপড়ে মুখ ঢেকে সেই ঝড়ে উধাও হয়ে ছুটতাম। ঝোড়ো হাওয়ার প্রকোপ বেশী হ'লে উপুড় হয়ে মাটিতে মুখ গুঁজে থাকতাম পড়ে, আর খেতাম বালি-কাঁকরের

ছর্‌রাগুলি। আপাদমস্তক ধূলিধূসরিত হয়ে যেত সেই বায়ব্য স্নানে, তবে সেটা গোরজঃ কৃতং নয়, কালবোশেখীর ফুৎকার-মারুতোত্থিতম্‌। তারপর কূয়োতলায় এসে হ'ত 'অবগাহ্যং তু বারুণম্‌' বালতির পর বালতি জলে। মাঝে মাঝে ত্ব-এক দিন অদৃষ্টে শিলাবৃষ্টিও জুটত। এই ধূলোটে মাষ্টার ছাত্রে ভেদাভেদ ছিল না।

স্নানের পর সবাই মিলে বসতাম মাঠে-ফেলা মস্ত একটা পুরানো তক্তাপোষের উপর। ছারপোকার দৌরাত্ম্য তাতে ছিল বলে তাকে রৌদ্রবৃষ্টির অন্তরায়ণে রাখা হয়েছিল। গানের আসরে আমরা যখন মশগুল তখন খাটমলদের রুধির-পারণা চলত দিনান্তে, যদিও আমরা কেহই ছিলাম না জৈনভাবাপন্ন। এই তক্তাপোষটি ছিল আমাদের গীতিবিতান। দিনুর * হাতে এস্রাজ, কণ্ঠে অমৃতলহরী। গানের পর গান চলেছে, বিরাম নেই। খোলা আকাশের তলে সমুৎসুক শ্রোতৃবৃন্দেব মাঝখানে সে গান অনির্বচনীয় মাধুর্য লাভ কবত। এই ছিল মোটামুটি তখনকার রোজনাম্‌চা।

মনে পড়ে এক দিন ত্বপুরবেলা খেয়ে দেয়ে বসেছি আমাদের পাঠচক্রে, এমন সময়ে দিনু বললেন—আজ পড়া নয়। সকলে মিলে চাঁদা ক'রে একটা কবিতার মক্‌স করা যাক্‌। তথাস্তু।

---

* দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

হঠাৎ কবিত্বের ভূত চাপল ঘাড়ে। এই পয়ারীয় চাঁদার ফণ্ডে প্রস্তাবক দান করলেন :

এস্রাজ, শোনা আজ সুমধুর তান,
মধুর সঙ্গীতে তোর ভরে যাক্ কান।

সবাই চুপ। মনে মনে কিন্তু কবিতার জাঁতাকল ঘুরছে। দিনুর পাশেই বসেছিলেন সতীশচন্দ্র। তিনি আকর্ণসন্ধানে তাঁর জ্যা আকর্ষণ ক'রে ছাড়লেন মর্ম্মভেদী বাণ :

কহিল এস্রাজ শত কান করি খাড়া
এ গরমে গান কি রে, ওরে লক্ষ্মীছাড়া !

তার পরেই বসে আছি আমি। নাচার, গণ্ডায় আণ্ডা দিতেই হবে। বলতে হ'ল :

তবে যদি শালী বলি মলি দাও কান,
গান বাহিরিতে পারে দুই-চারিখান।

সবাই মিলে হো হো করে অট্টহাস্য। অতঃপর পাঠারম্ভ।

আর এক দিন মনে পড়ে, ঘোর ঘনঘটা, আমরা ঝোড়ো হাওয়ায় ঝাঁপ দেবো ব'লে বাহির হয়েছি। এমন সময় মনে হ'ল, আকাশ বুঝি ভেঙে পড়ে মাথায়। ঠাণ্ডা দম্‌কা হাওয়ার সঙ্গে নামল বৃষ্টি, সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ ও বজ্রের ঝিলিক আর হুঙ্কার। বুকে বাজ পেতে নেবার মত মরীয়া আমরা কেউ হই নি। সুতরাং একছুটে উত্তীর্ণ হওয়া গেল কুঞ্জবাবুর কুটীরে। তিনি সে সময়ে আশ্রমের সহযোগীদের মধ্যে এক জন। তাঁর কুঁড়ে ঘরের দাবায় সকলে নিলাম আশ্রয়।

মুষলধারে বৃষ্টি নামল। সময়টা কাটে কী ক'রে। খেয়াল হ'ল একটা শারাদ (charade) অভিনয় করা যাক। তাড়াতাড়ি দুই অঙ্কের এক নাটিকার খসড়া ঠিক হয়ে গেল। গল্পটি নেই স্মরণে এইটুকু শুধু মনে আছে, সে হেঁয়ালি নাট্যের উত্তর হচ্ছে—'বিদ্যুৎ'। প্রথমাঙ্কে আছে 'বি' এবং দ্বিতীয় অঙ্কে 'দ্যুৎ'।

সাঁইত্রিশ বৎসর পার হয়ে সেই সব দিনের স্মৃতি আজ জাগছে মনে। জ্যোতির্বিদের মুখে শুনি, এমন সব তারা আছে, যারা নিবে গেছে অনেক দিন, তবু তাদের দীপ্তি এখনও আমাদের চোখে অনির্বাণ। জীবনেও তাই হয়। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা ঘটনা, যারা কালের প্রবাহে ভাসমান নৌকার মত কোন্ দিগন্তে লীন হয়েছে, স্মৃতির সাগরে ঢেউয়ের পর ঢেউ ভেসে আসে দীর্ঘ দেশকাল পার হয়ে, তাদের গতিধারার উজান পথে।

পুরানো ফটোর অ্যালবমে আলেখ্যগুলি প্রায় সবই যখন লুপ্তপ্রায়, তখন দু-একখানা ছবি চোখে পড়ে যা কালের রবারের সংঘর্ষে একেবারে মুছে যায়নি, তাদের মুখশ্রী সুস্পষ্ট রেখায় অঙ্কিত হয়ে আছে। আজও যেন চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাই তরুণ দিনেন্দ্রনাথের সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি, কানে আসে তাঁর গীতিনির্ঝরিণীর কলধ্বনি। রথীন্দ্রনাথের সেই কিশোর কান্তি, সলজ্জ অথচ সপ্রতিভ তাঁর ব্যবহার। সর্বদা নিজেকে পিছনে রাখতেন, কিন্তু প্রত্যেক খুঁটিনাটির প্রতি ছিল তীক্ষ্ণ-

দৃষ্টি। পুতুল নাচের ওস্তাদের হাতে থাকে সূত্রগুলি, পর্দার আড়ালে। তাদের অদৃশ্য টানে রঙ্গমঞ্চে চলে পুতুলের নর্মলীলা। পিছনে থেকে রথীন্দ্রের কাপ্তেনী চলত কতকটা সেই রকমের।

সতীশচন্দ্রের অনন্যসাধারণ কাব্যোন্মাদ আমাদের মুগ্ধ করত। মাঝে মাঝে মাত্রাধিক্যে একটু হাস্যরসের উদ্দীপনা যে না হ'ত এ কথা বলতে পারি না। মনে পড়ে গেল একটি দিনের কথা, সেদিন 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্'। সতীশচন্দ্র কলাপীর মত ঊর্ধ্বগ্রীব হয়ে আরম্ভ ক'রে দিলেন তাঁর আবৃত্তি :

হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মত নাচে রে।

ভাবোচ্ছ্বাসে উদ্দীপ্ত তাঁর মুখমণ্ডল। আমরা তন্ময় হয়ে শুনছি তাঁরই মর্মবাণী কবির জবানীতে। আবৃত্তি যখন এসে পোঁছল ঃ

ওগো, প্রাসাদ-শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে, কেশ এলায়ে ?

এই অংশটিতে, তখন তাঁর করসঞ্চালনা ও মুদ্রাবেগের ধাক্কায় ফুল্লমনা দিনেন্দ্রের চিত্তে হ'ল কৌতুকসঞ্চার। প্রথমে তো রুমালে মুখ ঢেকে মাথা নীচু করে রইলেন, তারপর এক বার আড়চোখে সতীশের দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র তাঁর সর্বাঙ্গে একটা চাপা হাসির ভূমিকম্প খেলে গেল। অতঃপর ত্বরিত উত্থান ও বেগে পলায়ন। সতীশচন্দ্রের ভ্রূক্ষেপও নেই।

নিরুপদ্রবে আবৃত্তিকে ভাবতরঙ্গে নৌকাডুবির হাত থেকে সমাপ্তিতে উত্তীর্ণ করলেন। যতদূর মনে হয়, বাইশ বৎসর বয়সে তার মৃত্যু হয়। যে বলিষ্ঠ ও সরস কাব্যবৈদগ্ধ্য সেই ক-দিনে তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছিলাম, এ দীর্ঘ জীবনে আর কোথাও তা দেখিনি।

আমাদের দেশে একটা কবিপ্রসিদ্ধি আছে, হাতী কমলবন বিধ্বস্ত করে, পটপট ক'রে পদ্মগুলি নেয় উপড়ে তার শুঁড়ে জড়িয়ে। বোলপুরের সেই দিনগুলির উদ্দেশে আজ বলি :

সরোবরে ছিল কমলিনী,
স্বেচ্ছাবন্দী মৃণালশৃঙ্খলে,
পড়িল সে করীর কবলে।
কুণ্ডলিত শুণ্ডে নিল ছিনি'
হস্তী তারে, তুলিল আকাশে
ছিন্নমস্তা কমলমণিরে।
প্রতিবিম্বখানি তার ভাসে
আজি স্তব্ধ সরসীর নীরে।
অটুট রহিল শুধু মাঝে
অবিচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম তন্তুগুলি,
তন্ত্রীসম আজি তারা বাজে
স্মৃতি যবে বুলায়ে অঙ্গুলি
মীড়ে মীড়ে মধুমূর্চ্ছনায়
তোলে সুর কম্প্র বেদনায়।

সেই ক-দিনের আশ্রমবাসের স্মৃতির সঙ্গে আমার মনে চিরন্তন হয়ে রইল, দিনেন্দ্রনাথের গান, সতীশচন্দ্রের কাব্যোন্মাদ, যতীন্দ্রের অতন্দ্রিত সেবা।

আশ্রমে এখন আয়োজনের বিপুলতা বেড়েছে। অধ্যাপকরা ও ছাত্রছাত্রীরা সংখ্যাবহুল। বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সমষ্টিগত শক্তি তখনই বলিষ্ঠ হয় যখন উদ্দেশ্য ও আচরণে তার উপান্ত অংশ-গুলির মধ্যে নিবিড় ঐক্য অক্ষুণ্ণ থাকে। বিজ্ঞান বলে, এক পিণ্ড লোহার প্রত্যেক কণা একটি স্বতন্ত্র চুম্বক। কিন্তু যখন তারা এলোমেলো হয়ে তাল পাকিয়ে থাকে, তখন তাদের অন্তর্গূঢ় চৌম্বকশক্তি পরস্পরের ঘাতপ্রতিঘাতে খণ্ডিত হয়, এবং মোটের উপর সেই লোহার টুকরোর সমবেত চৌম্বকশক্তি একেবারেই লুপ্ত হয়েছে মনে হয়। কিন্তু একটা প্রবল চুম্বক-দণ্ডের প্রভাবে ও অবমর্ষে তারা যখন একমুখী হয়ে দাঁড়ায়, তখন তাদের প্রত্যেকের পৃথক শক্তির যোগফলে সেই নির্গুণ লৌহপিণ্ডটি চুম্বকায়িত হয়ে ওঠে। সাধনাশ্রম মাত্রেরই অধিনায়ক সেই চুম্বক-যষ্টি যাঁর স্পর্শে ও প্রেরণায় প্রত্যেক শিষ্য ও উপাধ্যায় আশ্রমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠতে পারেন, যদি প্রতি চিত্তের ঐকান্তিক আগ্রহ ও আনুকূল্য তাঁর নির্দ্দেশের ছন্দানুবর্তী হয়। আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যখন স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দচিত্তে নিয়মাধীন হয়, তখনই আমরা আশ্রম রাষ্ট্র সমাজ সংসার সর্বত্রই বৈচিত্র্যের মধ্যেও শৃঙ্খলা ও শক্তির সমন্বয় করতে পারি।

এই আশ্রম ভারতের প্রাণকেন্দ্র হোক, বিশ্বভারতীর মহৎ আদর্শ আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করুক এই প্রার্থনা করি।

শান্তিনিকেতনে

গত মহরমের দিন কারমাইকেল মুস্‌লিম হোষ্টেলে ছিল নিমন্ত্রণ, একটি সাহিত্যিক সভার রথে সারথীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে কাঠের ঘোড়ার লাগাম ধরে চিত্রার্পিত চলৎভঙ্গীতে বসবার জন্যে। সভার পরে শ্রীমান শামস্থুল হুদা (ইনি শান্তি-নিকেতনের ছাত্র) আমাকে বললেন, আপনাকে বোলপুরে যেতে হবে। সেখানে আমাদের 'সাহিত্যিকার' বৈঠকে রইল নিমন্ত্রণ। প্রত্যুত্তরে বললাম, ছেলেবেলা ত টিনের এঞ্জিন নিয়ে খেলেছ। দু-চার দমের পরই ওর স্প্রিংটা যখন যেত কেটে, তখন নিশ্চয়ই ওর মুখে দড়ি দিয়ে ওকে চালিয়েছ। আমারও সেই দশা। আমার ইচ্ছাশক্তির স্প্রিংটা কেটে গেছে, কিন্তু চাকাগুলো ঠিকই আছে, এখনো ঘোরে। যদি নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে পার তবে ঠিক উত্তীর্ণ হব তোমাদের কেল্লায়। শামস্থুল বোলপুরে ফিরে গিয়ে ডাকে ওকালতনামা পাঠালেন তাঁর কবিবন্ধু আবুল হোসেনকে, আমার জড়ত্বকে বোলপুরস্থ করবার জন্যে। হঠাৎ আবুলের কাছ থেকে শমন এল : পাল্কি উঠাও, বোলপুরে ধাও। ফুকো পাল্‌কিটা কর্মকর্তৃবাচ্যে স্বয়মেব স্বেন গুণেন উঠল শূন্যে। শুভদিনক্ষণ দেখে যাত্রা করা গেল বোলপুরাভিমুখে কবি আবুল হোসেন সমভিব্যাহারে রবিবার সকাল ৮টা ৩৩ মিনিটের

ট্রেনে। কিন্তু শ্রেয়াংসে বহুবিঘ্নানি। আমাদের গাড়ীটা কিছুদূর অগ্রসর হয়ে হঠাৎ হ'ল অচল। ঘণ্টাখানেক মাঝ রাস্তায় ত্রিশঙ্কুর দশা প্রাপ্ত হলাম। যাহোক অবশেষে যথাস্থানে পৌঁছন গেল নির্বিঘ্নে। ষ্টেশনে দেখা হল ত্রিমূর্তির সঙ্গে—শামস্থল হুদা, রথীন্দ্র ঘটকচৌধুরী ও অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। ত্রিমূর্তি বলছি এইজন্যে যে, নিকটতর পরিচয়ে দেখলাম ওরা তিনে এক, একে তিন। আমার সঙ্গে আত্মীয়তাটা অবিলম্বেই যখন হল পাকা, তখন ওদের নাম দিলাম—ওল, কচু, মান। তিনই সমান। মোটর বাসে প্রায় একটার সময় উত্তীর্ণ হওয়া গেল শান্তিনিকেতনের অতিথিশালায়। ঝটিতি কাকস্নানান্তে গেলাম ওদের সঙ্গে বিদ্যালয়ের ভোজনাগারে। আমাদের প্রতীক্ষায় ওরা তিনজন এতক্ষণ ছিল অভুক্ত।

এই ভোজনশালায় ইতিপূর্বে একাধিকবার আতিথ্য গ্রহণ করেছি। পরিষ্কার বন্দোবস্ত, আহারাদির ব্যবস্থা অনাড়ম্বর পুষ্টিকর সুস্বাদু। পরমানন্দে একসঙ্গে খাওয়া গেল। এবার এবং আগেও লক্ষ্য করেছি, এই খাওয়ার ঘরে তদ্বির করেন একজন মহিলা। কি স্বদেশে কি বিদেশে মেয়েদের এই স্নেহ-সেবা ভোজন ব্যাপারটিকে মধুর ক'রে তোলে, মনে জাগে অন্নপূর্ণামূর্তি। আহারান্তে এই নবাগন্তুকের সঙ্গে ত্রিমূর্তির আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। মনটা গুরুদেবের সাক্ষাৎ লাভের জন্য ব্যাকুল হয়েছে, অপেক্ষা করতে লাগলাম কতকটা

অধৈর্যের সঙ্গে তাঁর কাছে যাবার জন্যে। কলকাতা থেকে রওনা হবার আগে কোনো খবর পাঠাইনি তাঁর কাছে, সুতরাং তাঁর অবগতির সম্ভাবনা ছিল না। বোলপুরে এসে দ্বিধান্বিত হলাম, ফস্ ক'রে তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হব কি-না। শুনলাম পরদিন বীরভূমযাত্রী ছাত্র-ছাত্রীদের 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকের নৃত্যগীতাভিনয়ের মোহড়ায় তিনি ব্যস্ত। অপেক্ষা ক'রে রইলাম অবসরের জন্য। রাত্রে ছেলেদের সঙ্গে অভিনয়ের রিহার্সাল্ দেখতে গেলাম। কবি সেখানে ছিলেন না, তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথও অনুপস্থিত। নৃত্যগীতের আনন্দ ও আশ্রমগুরুর অদর্শনের বিষাদ মনে নিয়ে ঘরে ফিরলাম। অনেক রাত্রি পর্যন্ত ছেলেদের সঙ্গে গল্প চল্ল।

পরদিন প্রাতে আর ধৈর্যে কুলালো না। সটাং গেলাম উত্তরায়ণে আমার পথের সাথী আবুলকে সঙ্গে নিয়ে। গুরুদেব তৎক্ষণাৎ ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কখন এসেছি। উত্তর শুনে বললেন, তুমি অপেক্ষা করলে কেন? এসে যদি দেখতে ঘরে খিল দেওয়া, তা হ'লে দরজা ভেঙেও ঢোকা উচিত ছিল তোমার। প্রতীক্ষার দুঃখটা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তাঁর মুখে স্বাস্থ্য আর স্ফূর্তির লক্ষণ দেখে মনটা নিশ্চিন্ত হ'ল। কবির রহস্যালাপের কথা লিপিবদ্ধ করতে হলে সর্বাগ্রে চাই শ্রুতিধর দিলীপকুমারের স্মরণশক্তি! আমার স্মৃতিদৌর্বল্য মদীয় নানা দৌর্বল্যের অগ্রণী। কবি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কথা বলে যাচ্ছেন, অমৃতময় লাগছে, কিন্তু ভাল ক'রে উপভোগ

করতে পারছি না। কেবল ভয় হয়, এত কথা বলে হয়ত পরে শারীরিক অবসাদ বোধ করতে পারেন। তাঁর প্রতি মুহূর্তের মূল্য আছে। বেশীক্ষণ ব'সে তাঁর সময় নষ্ট করা অকর্তব্য হবে। বিদায় নিয়ে উঠ্‌তে যাব, আদেশ করলেন আর একটু বসতে; হেসে বললেন, যখন প্রয়োজন বুঝব, বলব তোমাকে পালাতে। আশ্বস্ত হয়ে আরো কিছুক্ষণ বসব ঠিক করলাম। কবির ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরও সেই ঘরে ছিলেন। দিব্যি রসালাপ জমে উঠেছে এমন সময় কথাপ্রসঙ্গে কবি যখন আমাদের বাংলা দেশের বর্তমান অবস্থার বিষয়ে উপনীত হলেন তাঁর সহাস্য মুখে হঠাৎ একটা ভাবান্তর হ'ল। অত্যন্ত বেদনা ও নৈরাশ্যের সঙ্গে তীব্রকণ্ঠে বললেন, আমাদের আত্মঘাতী দুর্মতির দিকে কটাক্ষপাত ক'রে—কোনো আশা নেই, কিছু করবার নেই —defeatism defeatism, হার মানতে হবে, লোপ পেতে হবে আমাদের। অকস্মাৎ যেন বিনা মেঘে সেই হাস্যোজ্জ্বল ঘরে বজ্রপাত হ'ল। দেখলাম শুধু তাঁর আরক্ত মুখমণ্ডল এবং দ্রুত নিঃশ্বাসকম্পিত বক্ষস্থল। গভীর অনুশোচনা মনে জাগল, যদি আগে উঠে যেতাম, তা হ'লে তাঁর এই মানসিক উত্তেজনার জন্যে দায়ী হ'তে হ'ত না। কিছুক্ষণ সকলেই চুপ ক'রে রইলাম। তারপর আমি একটু সাহস ক'রেই বললাম, আপনার মুখে defeatism কথাটা কিছুতেই শুনব না। যখন জীবনে অবসাদ আসে তখন

আপনার গানই আমরা গাই : 'রাখিও বল জীবনে, রাখিও চির আশা।' যে সর্ষে দিয়ে ভূত ছাড়াই, তার ত্রিসীমায় ভূতকে এগুতে দেব না। যেখানে তরুণরা অকালবৃদ্ধ সেখানে আপনি সকলকে দেন প্রাণরস। আমরা শুকিয়ে শোলাও যদি হই, সমুদ্রের তলে ডুবিয়ে দিলেও আবার যেন ভেসে উঠতে পারি আপনার প্রসাদে। কবি তখনো নীরব। আমিও হয়েছি মরিয়া, তাঁকে একটু হাসাতেই হবে। বললাম, আমি যখন শিবপুর কলেজে ছিলাম, তখন আমার মেয়ের খেলাঘর থেকে একটা জাপানী পুতুল তুলে এনে রেখেছিলাম আমার টেবিলের উপর। তার তলাটা গোল আর ভারী, উপরটা ফাঁপা। সে পুতুলটাকে যতবার চাঁটি মারি, কাৎ হয়ে পড়ে, আবার পর মুহূর্তেই ঠিক মাথা খাড়া করে উঠে বসে। কলেজের ছেলেদের বলতাম, তেত্রিশ কোটি দেবতার বদলে এই দেবতাটিকে সামনে বসিও, আর কেবল মেরো চাঁটি, হাত ক্ষয়ে গেলেও দেবতাকে পারবে না কাৎ করতে। তখন প্রাণে পাবে সেই দুর্জয় শক্তি, যার বলে লাফিয়ে উঠতে পারবে শত পরাভবে।

ঠিক এতটা গুছিয়ে বলতে পারিনি। ভাঙা ভাঙা কথার সঙ্গে চাঁটির মুদ্রাভঙ্গীকে সচল ক'রে আমার অচল মনোভাবটা প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছিলুম। সে চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয়নি। আমার সবাক অভিনয়ে কৌতুকপ্রিয় কবির মনে হর্ষাভাস ফুটল। তাঁর মুখে চোখে দিব্যোজ্জ্বল হাসি দেখা

দিল, শিশিরসিক্ত পদ্মে রৌদ্রাভাসের মত। আমারও ঘাম দিয়ে ভয়ের জ্বর ছাড়ল! তখনকার মত বিদায় নিলাম।

সাঁইত্রিশ বছর আগে এসেছিলাম এই শান্তিনিকেতনে, তখন গুরুদেবের আত্মজ এই ব্রহ্মবিদ্যালয়টি সবে হামাগুড়ি দিচ্চে। সেই পূর্বস্মৃতির কথা 'সাহিত্যিকা'র বৈঠকে সেদিন রাত্রে বললাম। দিনকাল যেমন পড়েছে, তাতে এরূপ ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে বাঁচিয়ে রাখা যে পরিমাণে উত্তরোত্তর কঠিন হয়ে উঠছে, সেই পরিমাণেই এর অনপনেয় প্রয়োজনের গুরুত্বও বেড়ে চলেছে। আমাদের যুগে আমরা যে পরিমাণে সত্যভ্রষ্ট হয়েছি, চরিত্রহীন হয়েছি, বহির্মুখী হয়েছি, চিত্তের শুদ্ধি ও সমতা হারিয়েছি এবং সর্বোপরি ইহকালসর্বস্ব হয়েছি, সেই অনুপাতে আমাদের উত্তরকালীয়দের জীবন আরও কণ্টকাকীর্ণ, শ্রদ্ধাহীন, আস্থাহীন, উচ্ছৃঙ্খল, ঈর্ষাদ্বেষকলুষিত করে তুলেছি। দেশের এই বর্তমান দুর্গতির জন্যে আমরা যতটা দায়ী আর কেউ ততটা নয়। একথা আজ স্বতপরত হাড়ে হাড়ে বুঝচি। বাপ-মা প্রাণ দিয়ে ছেলেমেয়েদের রক্ষা করতে চায়। কিন্তু আমাদের এমনই মোহ, যে, প্রাণপণে তাদের মারবার চেষ্টাই করেছি, তাদের পারিপার্শ্বিক বেষ্টনীকে অসত্য উত্তেজনা ও বিদ্বেষের বিষে জর্জরিত করে। নিসর্গ হচ্চেন কাবুলিওয়ালা, সুদে আসলে দেনা উশুল ক'রে তবে ছাড়েন। আমাদের অনেক পুরুষের দেনার উপর আত্মিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বাজে খরচের দায়ে জাতকে জাত দাঁড়িয়েছি দেউলে

হবার পথে। এতে পিতৃপুরুষের দেনার দায় থেকে কতকটা বাঁচা যেতে পারে বটে, কিন্তু মাথা কেটে মাথাধরা সারানোর মত সে লাভ ভোগ্ করতে পারব না। তবু যদি পণ করি বাঁচতেই হবে আমাদের, তবে মারে কে? মানুষ মৃত্যুঞ্জয়, তার জীয়ন-মারণ কাঠি তার নিজের হাতে, আর কোথাও নেই। এই প্রাণধর্মে শিক্ষা ও দীক্ষার জন্যে চাই সত্যাশ্রয়ী শিক্ষায়তন। পরীক্ষায় খাতা টুকে প্রশ্নপত্রিকা চুরি ক'রে পাশ হ'লে চলবে না। সে পাপের বিষ অস্থিমজ্জাগত হয়ে থাকে, উত্তরকালে জীবনের কার্যক্ষেত্রে সর্বাঙ্গে দাগড়া ঘা হয়ে দেখা দেয়। সাহিত্যের পূতক্ষেত্রে সাধুনিন্দা পরনিন্দা ও চিত্তবিকৃতির বীজ বপন করলে তরুণতরুণীদের রক্ষা করতে পারব না। স্বাধীনতা মানে উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। পৃথিবীতে সঙ্গীতের চেয়ে মধুরতর বোধ হয় কিছু নেই। সুর আর তাল নিয়েই সঙ্গীত। সুর যদি হয় অ-সুর, আর তাল যদি হয় বে-তাল, তা হ'লে সঙ্গীত হয় অসুর আর বেতালের মল্লভূমি। এই শহরের ঘরে ঘরে বিজলি বাতি জ্বলছে আর কলের পাখা ঘুরছে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রশালায় যদি কলকব্জা সব ঠিক রেখে কেবল ধৃতিময় চীনামাটি বা ইবনাইটের টুক্রাগুলির বদলে বিদ্যুৎসঞ্চারী নিরর্গল ধাতুখণ্ডগুলি বসিয়ে দেওয়া যায়, আর একটার পরিবর্তে পাঁচশটা ডাইনামোর প্রতিষ্ঠা হয় তবে ক্ষণোৎপন্ন বিদ্যুৎপ্রবাহ ব'য়ে যাবে মাটির তলে, জ্বলবে না একটা বাতি, ঘুরবে না একটা পাখা। যার

স্থান একের কোঠায়, সেটাকে মুছে তার পিছনে হাজার শূন্য বসালেও সব শূন্য মিলে হবে হাজার গুণ শূন্য। এটা পুরানো কথা, সহজ কথা, মাথা ঘামিয়ে আঁক-ক'সে, বুঝতে হয় না। এ দেখেই ত গীতাকার বলেছেন বুদ্ধিভ্রংশাৎ প্রণশ্যতি।

রেডিয়াম থেকে নানারকমের বিকীরণ বাহির হয়। প্রাণবান মানুষ মূর্ত রেডিয়াম, বিচিত্র তার আত্মধারা। কবিগুরুর সর্বতোমুখী প্রতিভার নানাপ্রস্রবণের নিদর্শন চোখে পড়ে শান্তিনিকেতনের এই চাক্ষুষ প্রতিষ্ঠানে এবং তার চেয়ে বেশী অনুভূত হয় অন্তস্তলে এর অন্তর্গূঢ় প্রভাবে, এখানকার উদার মুক্তির মধ্যে আনন্দময় আব্‌হাওয়ায় নৃত্যে গীতে খেলায় অধ্যয়নপদ্ধতিতে ও আড়ম্বরবর্জিত সহজ সরল উপাসনায়।

কবির কাছে গেলাম পরদিন আমার স্মৃতিনিবন্ধের খস্‌ড়াখানি নিয়ে। ইতিমধ্যে আমি লোটাকম্বলসহ শান্তিনিকেতনের অতিথিশালা থেকে আশ্রয় নিয়েছি গুরুদেবের 'পুনশ্চ' কুটীরে তাঁর নির্দেশে। স্থানমাহাত্ম্য ব'লে ত একটা জিনিষ আছে। কবির নিভৃত আশ্রমনীড়, সেখানে আমি একা। বোলপুরের এই ভুবনডাঙ্গা একদা ডাকাতের পীঠস্থান ছিল, একথা ত জানেই গাঁয়ের পাঁচজনে। সুতরাং এই নিঃসঙ্গ অতিথিটিকে একলা পেয়ে সেখানে এল তরুণ ও খুদে ডাকাতের দল। শ্রীমান রথীন্দ্র ও অরবিন্দ এখানকার কলেজের ছাত্র। একজন আর্টস্‌-এর, আর একজন সায়ান্সের

পড়ুয়া। দুজনেই কবি, একজন লিরিক অপর জন কমিক। ওরা দুজনে দুই আন্‌কোরা খাতা এনে অতি মোলায়েমভাবেই বললে—খাতা দুখানির নামকরণ ক'রে দিতে হবে, অপিচ, প্রত্যেকটিতে একটি ক'রে নতুন কবিতাও লিখে দিতে হবে উভয়ের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর রেখে। ছুরিটা মিশ্রিরই হোক বা লোহার হোক—বেঁধে ঠিক। নিমিষেই বুঝলুম উদ্ধার নেই ওদের হাত থেকে, ওদের হুকুম তামিল না ক'রে। সর্দারদের হাতের মুঠোর মধ্যে যে হয়েছে অন্তরায়িত, তার কাছ থেকে পিল্‌-ডাকাতরাও মাশুল আদায় না ক'রে ছাড়ে না। এরা মডারণ ডাকাতের লিলিপুটীয় সংস্করণ এবং এই শিশুদের দলে বোধ করি ছেলের চেয়ে মেয়ের সংখ্যা অধিক হবে। সকলের হাতে একই হাতিয়ার—নামসই-এর খাতা। কেবল আত্মনাম বিঘোষিত ক'রে উদ্ধার পেলে বাঁচতুম। প্রত্যেক খাতায় অন্তত দু ছত্তর পয়ার লিখে দিতেই হবে। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। এদের ভ্রূ-ভঙ্গীতে কম্পান্বিত মসীসিক্ত প্রাণকে কলমের ডগায় আশ্রয় গ্রহণ করতেই হয়। সুতরাং প্রত্যেকের দাবী মিটোতেই হ'ল। শমন ধরিয়ে গেল, রাত্রে ওদের আস্তানায় রইল দাদুর নিমন্ত্রণ। মনটা এ নিমন্ত্রণে খুশীই হ'ল, ভাবি আঁচাবো কোথা?

সন্ধ্যাবেলা শিশুভবনের দাবায় গিয়ে বসলাম ওদের বৃদ্ধ-বৎসল আসনে। সামনের আবছায়াঘন মাঠে বসল ওদের

জটলা। মাল্যচন্দনে হ'ল আমার যথারীতি সভাপতিত্বে বরণ। আলো কেবল ওই খুদে জোনাকিদের চোখে, আর আমার পাশের একটা হারিকেন লণ্ঠনের ক্ষীণাভাসে। সুতরাং বৈঠকটা একরকম অন্ধকারেই বসল বলা চলে। সেই উৎসব সন্ধ্যার ভোজপঞ্জীতে, বেশী নয়, মাত্র উনিশটি উপভোগ্য বস্তুর তালিকা। এই বালখিল্য লেখক লেখিকাদের গল্প, কবিতা, ভ্রমণবৃত্তান্ত, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও সঙ্গীতাদির নির্ঘণ্টপত্র প্রসারিত রইল আমার সম্মুখে। যথাক্রমে আবৃত্তিগুলি পরিবেশিত হ'ল আমাদের উৎসুক শ্রবণে। এ ভোজে ত পাতে কিছুই পড়ে থাকতে পারে না, সকলেরই কানের ভিতর দিয়া মরমে পশে। চোখের ব্যবহার নেই বললেই চলে। পরমহংসদেবের একটি কথা পড়েছিলাম, ভগবান চিকের আড়ালে মেয়েদের মত। তিনি দেখেন সব, কিন্তু তাঁকে দেখতে পায় না কেউ। এক্ষেত্রে তার উল্টটা হ'ল সত্য, ওরা প্রায় সকলেই রইল আব্‌ছায়াঘন যবনিকার অন্তরালে, আর আমি রইলাম ওই ঝোড়ো লণ্ঠনের দীপালোকে। শুনলাম ওদের গানের পর গান, আবৃত্তি ও প্রবন্ধ পাঠ। বিস্মিত হলাম ওদের নিখুঁত কার্যপরিচ্ছেদে, সংযমে ও সুশৃঙ্খলায়।

কিন্তু সবচেয়ে তাক্ লাগল ওদের ভোটিং ব্যাপারে। শিশুসংসদের নানা বিভাগের প্রতিনিধি ও কর্মকর্তার নির্বাচন হ'ল যথারীতি প্রস্তাবক সমর্থক ও ভোটসংখ্যাদির গণনার সাহায্যে। প্রতি বিভাগেই একটি ছেলে ও একটি মেয়ে

নির্বাচিত হ'ল উভয়জাতীয় ভোটারের সমবেত সম্মতির যোগফলাধিক্যে। হাতে-লেখা পত্রিকার যুগ্মসম্পাদক ও কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্যসভ্যাদি বাছাই হয়ে গেল নির্বিরোধে বিনা বিতণ্ডায়। এ দৃশ্য আমার কলেজে, ইউনিভারসিটির সিনেটে সিণ্ডিকেটে, ব্রাহ্ম-সমাজের বার্ষিক সভায় ও নানা স্থানে প্রতিনিধিনির্বাচনের ক্ষেত্রে দীর্ঘ জীবনে প্রত্যক্ষ করেছি। ইংরেজী একটি কথা আছে Pandemonium বা দৈত্যদালান। আমাদের সকলের মধ্যেই দৈত্য ও দেবতা নিজ নিজ কক্ষে বাস করেন। বহুস্থলেই দেখেছি এই ভোটিং-ক্ষেত্রে সুপ্ত দানব জাগ্রত হয়। তার মঞ্জুবাক্ চিত্রপট এখনো চক্ষে কর্ণে ভাসে। তাদের তুলনায় এদের ভোট-সমস্যার এই সহজ সরল অপ্রমত্ত মীমাংসা দেখে যথার্থ বিস্ময় ও শ্রদ্ধা হ'ল। সভাপতির দুটি মাত্র কথা বলবার অবসরটি ঠিক স'রে এসে যখন পৌঁছল শেষকালে, অমনি ভোজনাগারের প্রথম ঘণ্টা উঠল বেজে, দ্বিতীয় ঘণ্টার পূর্বেই তাঁর বক্তব্য বিনা উদ্বেগে যথাস্থানে সমাপ্ত হ'ল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই সব ছেলেমেয়েরা যখন বড় হয়ে জীবনের কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে তখন এই ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষা নানা যৌথ ব্যাপারে তাদের কার্যপরিচ্ছেদকে সংযম ও সুষমা দান করবে।

যে কদিন গুরুদেবের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম সে কদিন প্রত্যহই তাঁর সঙ্গে একবার দেখা ও কথাবার্তা হবার সৌভাগ্য

হয়েছিল। আমার কর্মজীবনের পূর্বে একবার শান্তিনিকেতনে নব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানশিক্ষার লেবরেটারী গ'ড়ে তোলবার জন্যে কাঠবিড়ালের পদে বাহাল হয়েছিলাম। বিজ্ঞান সম্বন্ধে গুরুদেবের শ্রদ্ধা ও উৎসাহ অপরিসীম। পূর্বস্মৃতির জের টেনে আবার লেবরেটারীর নব সংস্কারের কাজে লেগে যাবার জন্যে আমাকে আহ্বান করলেন। তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথকেও এ বিষয়ে আগ্রহান্বিত দেখলাম। তাঁর ছোট কামারশালায় তাঁর স্বরচিত যন্ত্রের নমুনা দেখালেন। বিজ্ঞানের অধ্যাপক প্রমথনাথ সেনের সঙ্গে অনেক দিনের পর দেখা হয়ে বড় আনন্দ হ'ল। তিনি সম্পর্কে আমার নাতি-ছাত্র। সুতরাং তাঁর সঙ্গে রহস্যালাপ করবার পথ ছিল প্রশস্ত। তাঁর কুটীরে দেখা না পেয়ে লিখে এসেছিলাম: 'তৃষিত চাতক, চাঁদ পলাতক।' বিজ্ঞানী চন্দ্র সশরীরে এসে হাজির হলেন অনতিবিলম্বে। 'পুনশ্চ'র অলিন্দে ব'সে ঘণ্টাখানেক তাঁর সঙ্গে লেবরেটারী সম্বন্ধে শেয়ালের যুক্তি করা গেল। আমাদের গরীব দেশ। লেবরেটারী বহু ব্যয়সাপেক্ষ। বিদেশ থেকে যন্ত্র নির্মাণের তোড়জোড় কিছু কিছু সংগ্রহ ক'রে আমাদের স্কুল কলেজের ছোট লেবরেটারীতেই যন্ত্রগুলি তৈরী করা যেতে পারে। এ কথাটা কল্পনার সাহায্যে বলছি না। বিগত যুদ্ধের সময় শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজে পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগের জন্য সরকারী বার্ষিক বরাদ্দ বন্ধ হয়েছিল, তখন আমি তার তত্ত্বাবধানে ছিলাম। সে সময়ে

কতকটা নিজের হাতে যন্ত্রপাতি গ'ড়ে কাজ চালাতে হয়েছিল। আমার লেবরেটারীসংলগ্ন ছোট্ট একটা কারখানা ছিল, যেটা কলেজের বৃহৎ যন্ত্রশালা থেকে স্বতন্ত্র এবং আমার আয়ত্তের মধ্যে। সেখানে নিজের খেয়ালমত যন্ত্রাদি তৈরী করা যেতো এবং উদ্বৃত্ত কিছু কিছু বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটির কাছে ও অন্যত্র বেচে সরকারী তহবিলে কিঞ্চিৎ মুনাফা সংগ্রহ করা গিয়েছিল। সেই সব ছাতা-পড়া অভিজ্ঞতা যদি আবার সরাচাপা হাঁড়ি খুলে কাজে লাগানো যায়, এই নিয়ে কিছু জল্পনা কল্পনা করা গেল। আমার মত অ-কেজোর দ্বারা তার কতদূর কি হবে সে সম্বন্ধে আমার নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ আছে, 'অন্যে পরে কা কথা।'

অনেক দিন পরে শান্তিনিকেতনের প্রবীণ অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রীকে একটু কাছে পেলাম। আমি তাঁর distant admirer, নেপথ্যের ভক্ত। পথে ঘাটে এখানে ওখানে বহু বৎসর ধরে মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে। চুম্বকে আকৃষ্ট লোহার মত লীন হয়েছি তাঁর রসালাপে। তিনি এক জন অভিজ্ঞ ডুবুরি। ভারতের মধ্যযুগের ভক্তদের ভক্তিসাগরে ডুব দিয়ে সে অমূল্য রত্নাকর থেকে বহু রত্ন সংগ্রহ করেছেন। বাংলার আনাচে কানাচে বাউল সম্প্রদায়ের প্রকৃত উত্তরাধিকারীদের দর্শন ক্বচিৎ মেলে বহু সন্ধানে। তাঁদের গোয়েন্দা ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়। মাল্যচন্দনে বিভূষিত হ'য়ে কথকঠাকুর যখন বেদীতে ব'সে তাঁর অতুলনীয় বাগ্মিতা

ও রসবৈদগ্ধ্যে শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন তখন ভিড়ের চিকের আড়ালে যুগপৎ অশ্রুমোচন ও অট্টহাস্য করেছি আর সকলের সঙ্গে। এবার বোলপুরের পান্থশালায় প্রথম রাত্রি যাপনের পরদিন সকালে দেখি সুহৃদ্বর এসে উপস্থিত। তাঁর সঙ্গ নিয়ে উঠলাম তাঁর কুটীরে চায়ের নিমন্ত্রণে। এক পেয়ালা নিরাবিল ম্লেচ্ছ-মৌতাতের সঙ্গে বেলের মোহনভোগ উপভোগ ক'রে প্রাতরাশিক মৌতাত রক্ষার সঙ্গে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয় উদরসাৎ করা গেল। সেই অত্যল্প সময়ের মধ্যে কমা-সেমিকোলনবিবর্জিত জমাট রসালাপ চল্‌ল তাঁর সঙ্গে। বন্ধুত্ব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শুনলাম তাঁর মুখে। তাম্বুল চর্বণের ন্যায় মনে মনে আওড়াতে আওড়াতে চল্‌লাম গুরুদেবের দর্শনে। শ্লোকটি এই :

আরম্ভগুর্বী ক্ষয়িনী ক্রমেণ
লঘ্বী পুরা বৃদ্ধিমতী চ পশ্চাৎ।
দিনস্য পূর্বার্দ্ধপরার্দ্ধভিন্না
ছায়েব মৈত্রী খলু সজ্জনানাম॥

অর্থাৎ

প্রথমে ঘোরালো, স্বচ্ছতা লভে পরে,
আরম্ভে ক্ষীণ, ক্রমে দীঘল বিপুল,
দিনের দু-ভাগে ছায়া ভিন্নরূপ ধ'রে,
—সুজন-মিতালী হেরি তারি সমতুল।

উত্তরায়ণে এবার কবির ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রদ্ধেয় সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে নিকটতর পরিচয় হ'ল। বহুদিন পূর্বে

হিন্দুস্থান সমবায় মন্দিরে বৈষয়িক ব্যাপারে তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলাম। তিন সন্ধ্যা খাবার টেবিলে তাঁর সঙ্গে দেখা ও গল্প হ'ত। কলকাতায় ফিরবার পথে তিনি ও গুরুদেবের পুত্র রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে ট্রেনে এক কামরায় এলাম নানা আলোচনার ভিতর দিয়ে রেলযাত্রীর নৈঃসঙ্গ্যকে ভরাট ক'রে ওঁদের সাহচর্যে। সুরেনবাবুর সংযত মিতভাষণ, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-শক্তি, সূক্ষ্ম রসানুভূতি আমাকে মুগ্ধ করেছিল। বেশী কথা বলাটা আমাদের জাতীয় রোগবিশেষ, বাংলার ম্যালেরিয়ার মত। এই বাগ্‌বাহুল্যের হাটে মাঝে মাঝে এই রকম দু-একজন শান্ত গম্ভীর স্বল্প অথচ মিষ্টভাষীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে দৈবানুকূল্যে।

এ জীবনে সব সুখই স্বল্পায়ু। শান্তিনিকেতনের দুদিনের সুখ ফুরাল এবারকার মত। আসবার সময় কবিকে প্রণাম করে যখন বিদায় নিলাম তিনি সস্মিতমুখে বললেন, 'পুনরাগমনায়'। তাঁর সেই সস্নেহ নিমন্ত্রণটি শুক্লপক্ষের চন্দ্রকলার মত দিন দিনই বাড়ছে আমার মনে। সে আহ্বানটি যেদিন ষোলকলায় পূর্ণ হবে আবার ছুটে যাব তাঁর চন্দ্রাতপে। আমার সহযাত্রী শ্রীমান আবুল হোসেন আগেই চলে এসেছিলেন, সাহিত্যিকের বৈঠকে আধুনিক কবিতার ওকালতি সমাপনান্তে। কলকাতামুখী হয়ে বোলপুর ষ্টেশনে এসে দেখি অরবিন্দ ও রথীন্দ্র ষ্টেশনে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। ট্রেনে গিয়ে বসলাম, ওরাও বসল দুপাশে। তিনজনে মিলে

হলাম—যাকে বলে 'স্যাণ্ড্উইচ'। গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে, ওদের ওঠার লক্ষণ নেই। বললাম, তোমরা প্ল্যাটফর্মে নেমে দাঁড়াও, আমি জানলার কাছে গিয়ে বসছি। কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করল না ওরা। আতঙ্ক হ'ল ডাকাতের সর্দ্দাররা কি লুঠের মালের সঙ্গে লুণ্ঠিতের কোটরে ধাওয়া করে যাবে! আমি পুনশ্চ যখন বললাম, নেমে পড়, ঘণ্টা দিয়েছে, এক্ষুনি গাড়ী ছেড়ে দেবে, ওরা বললে, বর্দ্ধমানে গিয়ে নামব। কবির 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটি মনে এল। যথাসময়ে গাড়ী পৌঁছল বর্দ্ধমানে, ওরা চলে গেল ঃ

'তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।'

জন্মদিনে

আমরা ইদনীং "জয়জয়ন্তী ঝাঁপতাল" রাগিণীতে দিব্যি গলা সাধ্‌তে শিখেছি। মহৎ ও সজ্জন ব্যক্তিদের জন্মমৃত্যুর উৎসব শ্রাদ্ধাদিতে এরূপ একটা আয়োজনের উদ্দেশ্য যে সাধু তার সন্দেহ নেই। কিন্তু কীর্তনে নেচে গেয়েই যদি আমাদের ভাবাবেগ প্রশমিত হয়, সে প্রবর্তনা যদি আমাদের মন্থর বা অচল জীবনে গতির উদ্দীপনা না আনে তবে এসব সাময়িক উত্তেজনার সার্থকতা কি? বরং মনে হয়, সাধু ভাব ও সঙ্কল্প ক্ষণভঙ্গুর হ'লেও নিন্দনীয় নয়, একথা মেনে নিলেও ভাল কাজ ও কথার একটা বিপদ আছে। যদি সেই অনুষ্ঠান ও বাক্যের অনুযায়ী জীবনকে নিয়মিত ও পুনর্গঠিত করবার জন্যে একটা আন্তরিক প্রচেষ্টা না জাগে, প্রতিদিনের বিচিত্র কর্মকোলাহল ও গতানুগতিকতার মধ্যে বাহ্যাড়ম্বর ও স্তবস্তুতির অন্তর্নিহিত মহৎভাব ও আদর্শের অনুপ্রেরণাকে একেবারেই বিস্মৃত হই, তবে একথা বোধ হয় ঠিক যে, পুনঃপুনঃ ওই রূপ অন্তঃসারশূন্য বাক্যে ও আচরণে আমাদের প্রাণ ক্রমশ অসাড় ও দায়িত্ব-বোধশূন্য হয়ে পড়ে এবং যে মন্ত্র বা যজ্ঞানুষ্ঠানে ভূত ছাড়াবো তাকেই ভূতগ্রস্ত করে তুলি। ভালকথা গা-সওয়া হয়ে যায়, প্রাণ তাতে না। ভাল কাজ রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে পর্যবসিত হয়। তাই অনেক সময় ভাবি এ জীবনে ভাল কথা অনেক

শুনেছি ও বলেছি, সদনুষ্ঠানেও অল্পবিস্তর যোগদান করেছি। কিন্তু 'যে পান্নালাল সেই পান্নালাল' হয়েই যদি থাকলুম, তবে কি আর্যমন্ত্র ও শুভানুষ্ঠানের সত্যনাশ করলাম না? ঘৃত দাহ্যপদার্থ হলেও ভস্মে তার বহ্নিদীপ্তি জ্বলে ওঠে না। আমাদের অন্তরে অগ্নিহোত্রীর কুণ্ডটি যদি একেবারেই নির্বাপিত হয়ে থাকে, তবে আর ভস্মে ঘি ঢেলে বাজে খরচ করি কেন। তার চেয়ে ওই ঘৃতটুকু যথাস্থানে মালিশ করলে চাকরীর সুবিধা হতে পারে, নিদেন পক্ষে ঘরের লুচিটাও ভাজা যায়।

রবীন্দ্রনাথ একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ আমাদের এই বাংলা দেশে জন্মেছেন এবং আজ পর্যন্ত বেঁচে আছেন। এটা একটা গর্ব করবার জিনিষ বইকি। বিশেষতঃ যখন যাঁরা আমাদের নানারকমে করেছেন জুতোর শুকতলা, রাষ্ট্রিক সংস্থানেই হোক, আর জ্ঞানবিজ্ঞানের উদার মন্দিরেই হোক, তাঁরা যখন এক বাক্যে আমাদের এই স্বদেশীয়ের প্রশস্তি করেন, তখন রবীন্দ্রনাথের যশোময়ী হুক্কার আড়ালে আমরাও কিঞ্চিৎ তামাক টেনে পশ্চিমের মুখে ফুঁ দিই। আমার কথাগুলো হয় ত কটূক্তির মতই শোনাচ্চে, কিন্তু পরকে না বলে নিজেদের একটু রূঢ় বাক্য বল্‌লে অন্তে হয়ত কল্যাণ হ'তে পারে যদি তাতে আমাদের আত্মদৃষ্টি আত্মচিন্তা ও আত্মশাসন একটু উদ্বুদ্ধ হয়।

অবশ্য আপামর সাধারণ নিয়েই একটা দেশের জনমণ্ডলী। সব রকমেরই লোক আমাদের মধ্যে আছে। কাশীর বিশ্ব-

নাথের মন্দিরে আরতির সময় দেখেছি ভক্তের গদ্গদ মুখশ্রী, দুর্বৃত্তের চক্ষে লুব্ধ দৃষ্টি, অবিশ্বাসীর চক্ষে নির্লিপ্ত ভাব অথবা তথ্যসাংগ্রহিক কৌতূহল। রবীন্দ্র-সাহিত্যের মন্দিরে নানা রকম লোকের জটলা। তাঁর রচনা কেউ গভীর ভাবে পড়েছেন, কেউ বা উপর উপর, কারুর জ্ঞান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন ও বিচারতৎপর, কারুর আংশিক সূক্ষ্মানুভূতিতে প্রোজ্জ্বল, কেহ না পড়েই সুখ্যাতি করেন, কেহ বা নিন্দুকের রটনা বেদবাক্য ব্রহ্মবাক্যবোধে প্রচারতৎপর হন।

সর্ব দেশে সর্বকালে এক-একজন যুগপ্রবর্তক অবতীর্ণ হন। আমাদের এই ক্ষুদ্র বাংলা দেশে এক শতাব্দীর মধ্যে আমরা রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছি। আরও ছোট বড় অনেককেই পেয়েছি এই অত্যল্প কালের মধ্যে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যদি আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়ে থাকি, তবে এ কথাটা একবার ভেবে দেখবার জিনিষ, কেন এতগুলি মহাত্মার সাধনা আমাদের জাতীয় জীবনে এমন ব্যর্থতা লাভ করল!

একাধিক পত্রিকার থেকে অনুরোধ পেয়েছি রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে কিছু বলতে। বৃদ্ধবয়সে নিষ্কর্ম্মার পিঁজরেপোলে ব'সে শুধু যে নিভৃতে সাহিত্যের অনধিকার চর্চা করেছি তা নয়, স্বনামে বেনামে সেটাকে সাধারণ্যে প্রকাশ করেছি নানা পয়ারে। ঘরে খিল দিয়ে মানুষ যা খুসী তা করুক, তার ইষ্টানিষ্টের ফলভোগী সে নিজে। কিন্তু ছাপার হরফে

স্বনামেই হোক আর ছদ্মনামেই হোক যদি আত্মপ্রচার ক'রে অন্যের কাছে নিজের কথা শোনাবার জন্যে চেষ্টান্বিত হয়, তবে শ্রোতা বা সম্পাদকের মধ্যে কেউ যদি তাকে প্রশ্ন করেন, সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ভদ্রবিধিঅনুসারে কর্তব্য। আমার স্বগতোক্তিটা নিতান্ত আমারই। কিন্তু সেটা জনান্তিকে না হয়ে যদি অপরের সম্মুখে হয় তবে শ্রোতার উদ্দেশেই কথা চলা উচিত। তাঁরা শুনবেন কি কানে আঙুল দেবেন সেটা তাঁদের খুশীর উপর নির্ভর করে।

আজ রবীন্দ্রজন্মোৎসবের দিনে যে কথাটি মনে জাগছে একটু খুলে বলবার চেষ্টা করি। যাদৃশী সাধনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। রবীন্দ্রনাথ যদি যথার্থই আমাদের পূজনীয় হন তবে তাঁর ভাব ও চিন্তাকে সম্যক অনুশীলনের দ্বারা আয়ত্তাধীন করা আমাদের কর্তব্য। সর্বাগ্রে চাই চিত্তের উদ্বোধন। হাটের হট্টগোল আমাদের চারিদিকে। যে জলটা উর্মিচঞ্চল তাতে রবিচ্ছায়ার নিটোল জ্যোতির্মণ্ডলটি বিম্বিত হবে কেমন করে? যে ঘরে তীব্র বিজলির বাতি শতমুখে জ্বলছে এই চৈত্রা রজনীর জ্যোৎস্না সেখানে ত প্রবেশের পথ পায় না। বাতি নিভিয়ে বাতায়নে দাঁড়ালেই দেখি চন্দ্রমণ্ডলকে। জানালায় দাঁড়াতেও হয় না, উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়ে জ্যোৎস্নাধারা নিমেষে অন্ধকার ঘরকে শুভ্র জ্যোৎস্না-বিহসিত করে।

দারিদ্র্যের যাঁতার পেষণে মধ্যবিত্ত বাঙালী ছাতু হয়ে

যাচ্চে। আমাদের সদর অন্দর এই যাঁতার ঘর্ঘরে মুখরিত। কেউ কেউ বলেন, এ অবস্থায় কাব্যচর্চা করবার কথা কেবল বহুপুষ্টনিষ্কর্মা আলস্যস্ফীত বিলাসীর মুখেই শোভা পায়। রাজনৈতিক আন্দোলন কর, দেশকে আগে স্বাধীন কর, তারপর কোরো রসচর্চা যদি লালসা থাকে।

কারু মুখে শুনি অর্থনৈতিক দুর্দশা দূর করতে হলে চাই বিজ্ঞান। ইকনমিক্‌স্ পড়, যন্ত্রপাতি গড়, পেটে ভাত পড়ুক, পরণে এক টুকরো খদ্দর জুটুক, নাসিকান্ত পরমায়ুটা আগে হৃৎপিণ্ডস্থ হোক, তারপর বসিও তোমাদের কবিতার রশনচৌকি। অপর পক্ষে দেখি নবযুগের প্রগতি সমাজে ও সাহিত্যে। গড়ার দিকে নয়, ভাঙনের দিকে তার উৎসাহ। এ ব্যাপারে সব চেয়ে বড় সহায় অন্ধতা এবং অনুকরণ। এই দুটি জিনিষ উঠতে বসতে চোখে পড়ে পারিপার্শ্বিক অস্থিরতা ও সাহিত্যিক আবর্জনার মধ্যে। স্বাধীনতাকে পেতে চাই নিরঙ্কুশ উচ্ছৃঙ্খলতার ভিতর দিয়ে, আর পাটের দাড়ি গোঁফ ঝুলিয়ে কখনো বীণা হাতে নারদ ঋষি সাজি, বিশ্বের কুষ্ঠি কাটবার জন্যে, অথবা গোঁপ চুমরিয়ে গালপাট্টা ঝুলিয়ে তুলোর গদা ঘুরিয়ে ভীমসেনের পালা সাধি যাত্রার রঙ্গভূমিতে। এতেও তত ক্ষতি ছিল না। কিন্তু আর একজন লেগে যান, যা কিছু শুচি শুদ্ধ শ্রদ্ধেয় তার প্রতি বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষ জাগিয়ে দিতে। পরের কুৎসা শোনবার একটা মৌন আকর্ষণ আছে মানুষের অহমিকায়। অন্যকে ছোট করে আমরা নিজেকেই

বড় করতে চাই অজ্ঞাতসারে। যে অপরাধে নিজে শতাপরাধী, সেই পাপের জন্য অপরকে পদাঘাত করবার জন্যে আমাদের আত্মিক শ্রীচরণটা উদ্যত হয়ে ওঠে, পরের মাথায় সুপারি ঠোকবার জন্য তুলি বিশ্বকর্মার হাতুড়ি। ফলে দাঁড়ায় এই তরলমতি তরুণরা যখন এই সব গরল পান করে, তাদের চক্ষে দুনিয়ার যা কিছু ভাল সব হয়ে যায় ঝুটা। আমাদের জীবনটা হয়ে গেছে আঁস্তাকুড় নানা আবর্জনার স্তূপে। সুতরাং সর্বাগ্রে চাই চিত্তশুদ্ধি। এই পতিত জমিটা উদ্ধার করতে হবে। কোদাল দিয়ে এর কণ্টকাকীর্ণ আস্তরটা ফেলতে হবে চেঁচে—লাঙল দিয়ে ফেঁড়ে তুলতে হবে নিষুপ্ত উর্বরতা। পড়ুক তার উপর রবীন্দ্রসাহিত্যের বীজ। দেখি সোনার ফসল ফলে কি না আমাদের সোনার বাংলায়।

চিত্তের উদ্বোধনান্তে চিত্তসমাধান রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলিতে। কবিতা, নভেল বা প্রবন্ধের মত এক নিশ্বাসে আদ্যোপান্ত পড়ে ফেলবার জিনিষ নয়। কিছু কিছু পাতা উল্টে দেখা, এবং যেটা চোখে লাগে, ভাল করে মনঃসংযোগে পড়া। নিজের জীবনে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে না পড়লে কোনো কবিতার যথার্থ তাৎপর্য পাওয়া যায় না। আমার অব্যক্ত ভাব অস্ফুট অনুভূতি যাঁর ছন্দসুরে ফোটে, আমার মনের কথাটা যিনি টেনে বলতে পারেন, তিনি ত কবি। এই গুণেই ত কবি বিশ্বমানবের চিত্ত হরণ করেন, যে বোবা নিজের কথা বলতে নিজের কাছেও অক্ষম, তার মুখ ফুটিয়ে

দেন অন্তর্গূঢ় অনুভূতিকে কবিজবানীতে আবৃত্তি করার ভিতর দিয়ে। যে সব কবিতা পড়েও পড়িনি অর্থাৎ চোখ বুলিয়ে গেছি মাত্র, হৃদয়কে স্পর্শ করেনি, দরদী পাঠকের কাছে যখন তার আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা শুনলাম অমনি সেটা প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে গেল। এই জন্যে চাই পাঠচক্র। রবীন্দ্র-সাহিত্য অনুশীলনের জন্যে এই রকম আত্মীয়গোষ্ঠী আমাদের দেশে শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে যত দানা বাঁধবে ততই তাঁর রচনার দ্বারা আমরা অণুপ্রাণিত হতে পারব। রবীন্দ্রনাথ গানের সহস্রধারা। তাঁর ব্রহ্মসঙ্গীত, জাতীয়সঙ্গীত, প্রেম-সঙ্গীত আমাদের প্রাণের সাহারা গোবিকে মুঞ্জরিত ক'রে তুলতে পারে পুষ্পমালঞ্চে। রবীন্দ্রনাথ সীমার বেষ্টনীর মধ্যে অসীমের কবি, ভাষার সীমানা যেমন বিগলিত হয় সুরে, ফুলের সৌরভ যেমন পরিমিত পেলব দলগুলির বন্ধন ছিন্ন ক'রে পরিব্যাপ্ত হয়ে যায় বাতাসের অসীমানায়, নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে পাই সে পরিমল অন্তস্তলে।

রবীন্দ্রনাথের অগ্রসারিণী গতি প্রাণহীন বিধি নিষেধকে ভেঙে প্রবাহিনী ধারার মত ছোটে অনন্তাভিমুখে, উভয় তটের বন্ধনকে স্বীকার করে, তার মাটি আপনার বক্ষের ভিতর তরলিত করে, উভয় তীরের শস্যক্ষেত্র সোনার ধানে ভরে তুলে, পল্লীলক্ষ্মীদের ক্ষুদ্র ঘটগুলি গঙ্গোদকে পূর্ণ ক'রে। তাঁর গানের অপূর্ব সুরগুলি, যার ভিতর কথার কর্পূর বাষ্পীভূত হয়ে আছে, সেই অনির্বচনীয়ের স্বরাভিব্যক্তি যাতে নিখুঁৎভাবে রক্ষিত ও

প্রচারিত হয় এই যন্ত্রযুগের গ্রামোফোন ও ব্রড্কাষ্টিঙে, সে জন্যে বিধিমত চেষ্টা ও ব্যবস্থা করা কর্তব্য। কবির 'গানের ভাণ্ডারী' দীনেন্দ্রনাথ আজ নেই, কিন্তু তাঁর শিষ্য-শিষ্যার সংখ্যা অপ্রতুল নয়। তাঁদের কাছ থেকে এই সুরগুলির আহরণ ও সংরক্ষণের চেষ্টা করতে হবে। একটা দীপশিখা দিয়ে দীপালির মালা গাঁথা যায়। সৌভাগ্যক্রমে আজকাল গানের চর্চা আমাদের দেশে সজোরে চলেছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতকে অমর করবার ভার এই তরুণ গায়কগায়িকাদের নিতে হবে। তাঁরা যে শুধু এই গানের মুক্তধারাকে বর্দ্ধিষ্ণু করবেন শুধু তা নয়, এই গানের ভিতর দিয়ে তাঁরা নিজ নিজ জীবনে অমৃত-উৎসের সন্ধান পাবেন।

হিন্দু সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারকল্পে রবীন্দ্রনাথের দান অপ্রমেয়। যদি একবার কল্পনা করা যায়, রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন নি, তাহলে শিক্ষিত সম্প্রদায় বুঝতে পারবেন আজ যে ভারতীয় কাল্চার বা কৃষ্টির অতিবৃষ্টি আমাদের বক্তৃতায় সংবাদপত্রে বিঘোষিত হচ্চে তার গঙ্গোত্রী রবীন্দ্রনাথের লেখনীর সূচ্যগ্রে কতখানি উৎসারিত হয়েছে। প্রাচীন কাব্যসংগ্রহের থেকে আরম্ভ করে মেয়েলী ছড়া পর্যন্ত বাদ পড়েনি। উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান, পৌরাণিক কথামৃত, বৌদ্ধসাহিত্যের অবদান কিছুই বাদ পড়ে নি। যে পশ্চিম আমাদের চিন্তারাজ্যে যুগান্তর এনেছে, নির্বিচার গলাধঃকরণে অনেক স্থলে সুধা পরিণত হয়েছে যে বিষে, খোষা ও ঠোঙার ভক্ষণজনিত অজীর্ণতায়,

সেই পশ্চিমকে যুগপৎ বরণ ও বর্জন দ্বারা তিনি আমাদের বঙ্গ-ভারতীকে বিশ্বভারতীয় ক'রে তুলেছেন। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠানটি কবির সার্বজনীন উদার দৃষ্টির প্রতীক। মানুষের সঙ্গে মানুষের সংস্পর্শ যে বিশ্বমানবকে অবতীর্ণ করে সে নিগূঢ় সত্য মন্ত্রদ্রষ্টা কবির চক্ষে সমুজ্জ্বল। তাই পূর্বপশ্চিমের মিলনক্ষেত্র বোলপুরে—চীন, জাপান, আমেরিকা, জার্ম্মাণি, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইরাণ, তুরাণ সবাই এক ঘাটের জল খেয়ে গেছেন। এই পুণ্যতীর্থ বিশ্বমানবের জন্যে উন্মুক্ত। সর্বদেশ ও সর্বকালের মনীষীরা গ্রহণ করেন এই আশ্রমের আতিথ্য, বাস করেন সূক্ষ্ম শরীরে এই আশ্রমের পুস্তকাগারে।

...

কবির জন্মবাসরে তাঁর দুটি কথা উদ্ধৃত ক'রে আমার বক্তব্য শেষ করি :

বাংলার মাটি বাংলার জল
সত্য হোক সত্য হোক সত্য হোক হে ভগবান্ !

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।

নজ্‌রুল ইস্‌লাম

কবি নজ্‌রুল ইস্‌লাম আমার আন্তরিক স্নেহ ও শ্রদ্ধার পাত্র। প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে একথা ঠিক বলবার নয়, অন্ততঃ আমার পক্ষে, যে আমি ঘরে ব'সে ইংরেজিতে বলতে গেলে Can talk the hindleg of a mutton off— অর্থাৎ, কথার দাপটে দুম্বাকে অধমাঙ্গহারা করতে পারি— কিন্তু সভায় দাঁড়ালেই রসনার মৌখর্য পালিয়ে গিয়ে জুতোর শুকতলার তলে ঢুকে যায়। তবু মাঝে মাঝে যে ব্যতিক্রম ঘটেনি তা নয়। কখনো বাহিরের খোঁচায়, কখনো বা বন্ধুত্বের দেনাশোধের তাগিদে, ক্বচিৎ অন্তরের প্রেরণায়। আজ মনের তাড়ায় মুখ খুলছি। এটা সভায় দাঁড়িয়ে চোখ-কান বুঁজে আমার স্বগতোক্তি। এ রকম চেঁচিয়ে চিন্তা করার মধ্যে হয়ত অসংযম আছে। কিন্তু বন্যায় বাঁধ ভাঙে, তা হৃদয়ের অন্তঃসলিলায় হোক অথবা পদ্মা নদীর তটেই হোক। দার্জিলিঙ পাহাড়ে চড়বার সময় দেখি ট্রেণের সামনে পিছনে এঞ্জিন্ জুড়ে দেয়, যুগপৎ টানা ও ঠেলার চোটে ট্রেণ ছোটে দুর্গম গিরিলঙ্ঘনে, তার পদচক্রগুলিতে জাগে ঘূর্ণ্যাবেগ। আপনাদের আকর্ষণ এবং আমার অন্তঃপ্রেরণা আমাকে পঙ্গুর আস্তাবলে থাকতে দিল না।

কথা দরদী শ্রোতার অপেক্ষা রাখে। কেউ কেউ কাছে এলে মুখে খই ফোটে, আবার কারু উপস্থিতিতে রসনা হয় মৌনব্রতা। যাঁদের নিমন্ত্রণে এসেছি তারা নজরুলের ভক্ত। ছেলেবেলা একটি বৈরাগী আমাদের পাড়ায় ভিক্ষা করত এই গানটি গেয়ে—'যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই আমার প্রাণ রে'। নজরুল আমাদের সকলেরই প্রিয়, তাই Things which are equal to the same thing are equal to one another—এই জ্যামিতিক সত্যের প্রসাদে বেশ অনুভব করছি আত্মীয়মণ্ডলীর মধ্যেই এসেছি, সুতরাং চাবী দেওয়া মুখটা আপনি যায় খুলে।

জড়বস্তু বিনা ধাক্কায় নড়ে না। সজীব যে, তার একটা লক্ষণ হচ্চে সে স্বৈরগতি। দেহে সজীব হয়েও আমরা প্রাণে যখন মুহ্যমান হয়ে পড়ি তখন জড়পিণ্ডবৎ হই অনড়। আবার বাহিরের চাপে প'ড়ে আবেগবান প্রাণও হয় গতিহারা আত্মদৌর্বল্যে, পারিপার্শ্বিক বিঘ্ন-বাধাকে দূর করবার সামর্থ্যের অভাবে। এই রকম প্রাণশক্তিহীন প্রাণীদের মাঝে যখন একজন আবেগবান্ আবির্ভূত হন তখন অচলের বুকেও চাঞ্চল্য জাগে। ছুঁচ্ যখন কাপড় ফুঁড়ে বেরোয় তখন তার সঙ্গে সুতোও চলে অবলীলাক্রমে। বাস্তবিক একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারি, পৃথিবীতে কেবল দুই শ্রেণীর মানুষ আছে। একদল সংখ্যায় নিতান্ত নগণ্য, কিন্তু তাঁরা এঞ্জিনের মত, চলিষ্ণু। আর একদল যারা গুনতিতে শতকরা

নিরানব্বইয়ের চেয়েও বেশী, তারা চালালে চলে বটে, আপনি নড়ে না—তা Royal saloon হোক বা মাল বোঝাইয়ের Wagonই হোক। কবি নজ্‌রুল এই রকম একজন এঞ্জিন-মার্কা মানুষ।

মানুষের জীবনটা যে নদীর ধারা, এই সহজ সত্যটিকে আমাদের হৃদয়ঙ্গম করাবার জন্যে Romain Rolland চার ভলিউম্‌ এক উপন্যাস লিখেছেন। যুগ থেকে যুগান্তর কেমন ক'রে রচিত হয় এই প্রাণবাহিনী ধারায়, বিদেশের দৃশ্যপটে যখনই এই ছবি দেখি, তখন আমাদের চোখে খুলে যায় সেই ছবি, যার আনুকূল্যে আমাদের জাতীয় জীবনে এই প্রাণোচ্ছল ধারার ঋজুকুটিল গতিরেখাটি লক্ষ্য করি প্রাণবান গতিমান ব্যক্তির যাত্রাপথে। বাংলার নবযুগের ইতিহাসে কবি নজ্‌রুল এই রকম একটি বাঁধভাঙা নদী।

নানা গণ্ডীর আবেষ্টনের মধ্যে আমাদের রক্ষণশীল জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষেত্রগুলি আবদ্ধ। কিন্তু যে আকাশ এই সীমাখাচত খণ্ডবিখণ্ড সংসারের ঊর্ধ্বে প্রসারিত, সেখানে ত কোনো ভৌগোলিক বা সাম্প্রদায়িক বা সামাজিক বিভেদের প্রাচীর খাড়া নেই। আমাদের অন্তর্লোকে এই রকম একটি উদার অন্তরীক্ষ আছ। সর্বদেশের সর্বকালের কবিরা মুক্ত পক্ষে বিহার করেন এই অসীম অম্বরে, তাঁদের সঙ্গীত আনে প্লাবন, সংস্কারের চৌহদ্দিবাঁধা সঙ্কীর্ণতার ভিতর। তাঁদের পক্ষ-ঝঞ্ঝায় শৃঙ্খলমুক্ত হয় ঊনপঞ্চাশ বায়ু। তারা হুড়্‌দাড় করে

ভাঙে বর্ণভেদের, ধর্মভেদের ও রাষ্ট্রভেদের প্রাকার, আনে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বিমুক্ত মানবীয় প্রাণবায়ু, আমাদের এই রুদ্ধশ্বাস বক্ষে প্রাণহীন আচার অনুষ্ঠান গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে জাগায় প্রবল বিদ্রোহ।

এটা সাময়িক, ক্ষণভঙ্গুর ঘূর্ণ্যাবেগ। সব দেশের, সব কালের কবি মনীষীরা বিদ্রোহী। John Morley যিশু খ্রীষ্টকে The arch anarchist নামে অভিহিত করেছেন। প্রাচীন ইহুদী ধর্মের অন্তঃসারশূন্য বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ। মোহাম্মদ আরবের উপকূলে এনেছিলেন এই প্রাণ-ঝঞ্চা। বুদ্ধদেব হৃদয়হীন কর্মকাণ্ডনিষ্পিষ্ট ভারতে এনেছিলেন ত্যাগ ও বৈরাগ্যের অভয়বাণী। এই বাংলা দেশে শ্রীচৈতন্য এনেছিলেন প্রেমবন্যা। বর্তমান যুগের প্রবর্তক রামমোহন এনেছেন সার্বভৌমিক ধর্মের বীজমন্ত্র। তিনি যুগপৎ সংস্কার-ধর্মী ব্রাহ্মণ, জবর্‌দস্ত মৌলবী ও একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টান বলে পরিগণিত হয়েছেন তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে।

কবি হচ্চেন কবিরাজ। তাঁর চিকিৎসা অস্ত্র চিকিৎসা নয়। কেহ যশের জন্যে, কেহ অর্থের জন্যে, কেহ অনুচীকির্ষায়, কেহ বাগ্‌ব্যায়ামের উদ্দীপনায়, কেহ অবসর বিনোদনের খেয়ালে বাণীমন্দিরে জটলা করেন। দেবী প্রতিমা হঠাৎ যদি জাগ্রত হয়ে এই ভক্তবৃন্দের প্রতি নেত্রপাত করেন, তবে তার অন্তর্দর্শী দৃষ্টির সম্মার্জনীতে সে মন্দির নিমেষেই প্রায় জনশূন্য হয়ে যাবে, পড়ে থাকবে কেবল দু-একটি পূজারী, যারা পাবে

তাঁর আশীর্হস্তের স্পর্শ। এঁদের কাব্যসাধনা, অহৈতুকী, অনন্যমনা, অতন্দ্রিত। এঁরা ছন্নছাড়া, আত্মভোলা, নিঃসংগ। আমার মনে হয় নজরুল এঁদেরই একজন।

বিশ্বসৃষ্টিকে মানুষ পায় আপনার চেতনার দর্পণে। এই ছায়াচ্ছবি আমাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের অনুপাতে নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। এই বোধশক্তি বা অনুভূতি সকলের সমান নয়। কোনো কোনো অন্তরে এই চেতনায় থাকে বারুদ, দপ্ করে জ্বলে ওঠে শিখায়। তখন সে হয় স্বয়ম্প্রভ। সূর্যের কিরণে যেমন আছে সৃজনী শক্তি, মানব হৃদয়ে এই সুদুর্লভ বহ্নি শিখাটিও তেমনি সৃজনধর্মী। সে সৃষ্টি করে আপনার অন্তর্দীপ্তিময় সৌরজগৎ। এই অগ্নিহোত্রী চিত্ত যাঁদের তাঁরাই কবি। আত্মরচনার মাঝখানে তাঁদের ব্যক্তিত্ব মাধ্যাকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুর মতই অচল প্রতিষ্ঠা লাভ করে এই চিরচাঞ্চল্যময় জগতে। বাহিরের হিসাবে আমরা কবিকে শিল্পীকে চির অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানীকে উৎকেন্দ্র বলি, উন্মাদ বলি, উচ্ছৃঙ্খল বলি, কিন্তু নিজ ব্যক্তিত্বের ভারকেন্দ্রে তাঁরা স্থিতধী, অনুদ্বিগ্নমনা, বিগতস্পৃহ। নজ্রুলের কবিতা ও গীতাবলির মধ্যে বাংলা সাহিত্যের আকাশে আমরা একটি সমুজ্জ্বল নক্ষত্রের দীপ্তি লাভ করেছি।

সাধু Thomas à Kempisএর একটি উক্তি আছে "Search not who spoke this or that, but mark what is spoken." কার বাণী সে খোঁজে কাজ নেই, কী

তিনি বলেছেন তাই লক্ষ্য কর। সত্যান্বেষীর পক্ষে কথাটি সারগর্ভ হলেও আমরা সকলেই কাব্যের মধ্যে কবির পরিচয় খুঁজি। শেলি, ব্রাউনিঙ, হুইটম্যান প্রভৃতি কবিদের রচনায় তাঁদের একটি কাব্যিক মূর্তি আমাদের বিস্মিত দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে। এই ব্যক্তিত্বের ছাপ প্রত্যক্ষ করি নজ্‌রুলের রচনায়। তিনি ভাল ক'রেই নিজের বলিষ্ঠ ও প্রেমিক হৃদয়ের চিত্রটি মুদ্রিত করে দিতে পেরেছেন তাঁর গীতিকাব্যে। তাঁর লেখার সঙ্গে তাঁর জীবনের দিব্যি খোলে-বোলে মিল। কোথাও কৃত্রিমতার লেশ নেই। এই অকপট স্বচ্ছতায় তাঁর কবিতা ও গান স্ফটিকের মত দীপ্তোজ্জ্বল।

ছন্দের নিগড়, সুর-তালের সুসংযতি যেমন বাণীকে কঠিন শাসনে নিয়ন্ত্রিত করে তার অবাধ মুক্তির ভিতর, তেমনি প্রকৃত কবি যিনি, তাঁর অন্তর্গূঢ় ভাব ও চিন্তা ঘণীভূত হয় মননে ও নিদিধ্যাসনে। যত উর্ধে উৎসমুখের গুপ্তভাণ্ডার, তত বেগবতী হয় তার নিম্নগাধারা। কবির অন্তরে আছে সেই হিমাদ্রি কন্দর, যেখানে তিনি ধ্যানাসনে আসীন, নৈঃসঙ্গে ও নৈঃশব্দে পুঞ্জীভূত হয় সেখানে তাঁর সমগ্র বেদনা ও আনন্দের তুষার সম্ভার! বাণী বিগলিত মুক্ত ধারা যখন নেমে আসে কল-কল্লোলে প্রবল আবেগ বক্ষে ধারণ ক'রে, তার উদ্দাম স্রোতে ভেসে যায় কত ঐরাবত, কত শবাস্থিপঞ্জর লাভ করে পুনরুজ্জীবিত পরমায়ু। ভাবোদ্বেল প্রেমিক নজ্‌রুলের গিরিনির্ঝরিণী নব প্রবর্তনা লাভ করুক প্রাণের উত্তুঙ্গতম

হিমাচল শৃঙ্গে, বাংলার মরাগাঙে নামুক তার জাহ্নবী ধারা। আমরা হিন্দু-মুসলমান ধন্য হ'ব সে গাঙ্গ-প্রবাহে অবগাহন করে।

রবীন্দ্র জন্মোৎসবে

কবি আত্মিক সম্পর্কে বিশ্বমানবের আত্মীয়। তবু বাঙ্গালীর কাছে তিনি তাঁর সোনার বাংলার কবি। ব্রাহ্মসমাজের 'ইষ্ট গোষ্ঠীর' মধ্যে তিনি আচার্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র আচার্য রবীন্দ্রনাথ। বলা বাহুল্য ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর পরিধিকে লক্ষ্য করে একথা বলছি না। ব্রাহ্মসমাজের চতুরঙ্গ উপাসনা, জাতকর্ম, জন্মতিথি, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি প্রত্যেক পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে যে ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হয়, বোধ করি শতকরা তার নব্বইটি রবীন্দ্রনাথের গান। সান্ধ্য মজলিশে চায়ের বৈঠকে শুনি কবির প্রেমসঙ্গীত। সে ত আজ নয়, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগেকার কথা বলছি। তখন এই ব্রহ্ম-মন্দিরের সামনে রাস্তার ওপারে লাহাদের বাড়ীটি ছিল বহু ব্রাহ্ম-পরিবারের আস্তানা। এই বৃহৎ অট্টালিকার দক্ষিণাংশে ছিল পুরাতন হিন্দুগৃহের ঠাকুর দালান, সম্মুখে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। সেদিন এই ঠাকুর দালানে বসেছিল বিলাত থেকে অভ্যাগত একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টান কোনো বিশিষ্ট অতিথির অভ্যর্থনা সম্মিলন, তখনকার 'ব্রাহ্মবন্ধু সভা'র নিমন্ত্রণে। আমি তখন কিশোর-বয়স্ক। কবিকে সেই প্রথম দেখলাম সেই দীপোজ্জ্বল উৎসব-ক্ষেত্রে। শুধু চোখের দেখা নয়, শুনেছিলাম তাঁর দুটি গান আনন্দ ও বিস্ময়বিহ্বল চিত্তে। দীর্ঘ ঋজু দেহ আস্কন্ধবিলম্বিত

কুণ্ডলায়িত অলকদাম। পরিধানে ছিল ইজের ও আজানু-বিলম্বিত আচ্‌কান, বুকের উপর বোতামের সারি। উত্তরকালে যখন Gœthe in Weimerএর ছবি দেখেছিলাম তখন আমার সেই সন্ধ্যার কথা মনে পড়েছিল। কবি তাঁর 'মায়ার খেলা' থেকে যে গান দুটি গেয়েছিলেন আজও তার ঝঙ্কার যেন কানে বাজে।

প্রথম—"কি হল আমার বুঝিবা সজনী,
হৃদয় আমার হারিয়েছি।"
দ্বিতীয়—"অলি বার বার ফিরে যায়,
অলি বার বার ফিরে আসে,
তবে ত ফুল বিকাশে।"

তিনসপ্তকবিসর্পী সে প্লুত মধুর কণ্ঠস্বর। সুরলোকের স্বর্গমর্ত্তপাতালে তার অবাধ পরিক্রমা। কবির যৌবনের সেই কণ্ঠধ্বনি যাঁরা শুনেছেন তাঁরা বুঝ্‌বেন আমার এ বর্ণনায় অত্যুক্তি নেই। যাঁরা শোনেননি তাঁদের কী বলে বুঝাব?

রবীন্দ্রনাথ গানের গঙ্গোত্তরী। তাঁর গানের কথাও সুর 'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ' কর্ণের কুণ্ডলকবচের মতই বাক্যের সঙ্গে তান সহজাত। তাঁর সুরসৃষ্টি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। যত হয় ততই ভাল। তবে এই কথাই মনে হয়, পাখীর পালক যেমন বিচিত্র রঙে গজিয়ে ওঠে তার ত্বক ভেদ করে তেমনি তাঁর গানের কথাগুলি উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছে সুরে সুরে। বুঝি আরও নিবিড়তর তাদের সম্পর্ক, কথাগুলি যেন

বাষ্পীভূত হয়ে গেছে সুরে, সুর ঘনীভূত হয়ে জমাট বেঁধেছে কথার স্ফটিকগুচ্ছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটা বিশিষ্ট টেক্‌নিক্ বা কায়দা আছে। সেটাকে আয়ত্ত করতে হলে প্রবেশ করতে হবে তার ভাবের অন্তঃশীলায়। নতুবা কেবল সুরের কারচুপি দিয়ে তার অন্তর্গূঢ় স্বরূপটি ফুটাবার নয়।

রবীন্দ্রনাথ যে বীজ বপন করেছেন এবং করছেন বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে, তার সোনার ফসল ফলাতে হলে চাই সর্বাগ্রে আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে তার অনুকূল বৎসল ভূমি। আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শুদ্ধি ও সত্যের আশ্রয়। কবিতায় গানে প্রবন্ধে উপন্যাসে তিনি যে প্রেরণা আজ অর্ধশতাব্দীর অধিক বাংলাদেশকে দিয়ে আসছেন, সেই আদর্শ ও ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনে আমরা যদি যত্নবান না হই, তবে তাঁর শিক্ষাদীক্ষা আমাদের পক্ষে ভস্মে ঘৃতাহুতির মতই নিস্ফল হবে।

বিধাতার আশীর্বাদে আজও তাঁকে আমরা হারাই নি আমাদের এই দুর্গতির দিনে। তাঁর নশ্বর জীবনপদ্মে অশীতিতম দলটি নবোদ্ভিন্ন হ'ল সেই আনন্দে আজ আমরা সমবেত হয়েছি এই উৎসব সভায়। তিনি শতায়ু হোন, পূর্ণশতদলে ফুটুক তাঁর পার্থিব পরমায়ু, এ প্রার্থনা স্বাভাবিক হলেও লৌকিক প্রার্থনা। অদ্য বর্ষশতান্তে বা মৃত্যুবৈ প্রাণিনাং ধ্রুবম্। কোনো প্রার্থনাই ত দেহকে মৃত্যুঞ্জয় করতে পারবে না। কিন্তু যে অমর দীপটী তিনি জ্বেলেছেন তাঁর সমগ্র

জীবনের সাধনায়, তার শিখায় যদি আজ বাঙ্গালার ঘরে ঘরে গৃহদীপ জ্বলে, তবে এই জন্মোৎসবের রাত্রি হবে দীপান্বিতা আমাদের সম্মিলিত হৃদয়ের দীপালিমালায়।

আমার মগ্ন চৈতন্যে ছিপ ফেলে কবির দু একটা পূর্বস্মৃতি ধরে তুলব বলে বসেছি। ফাৎনা নড়তেই হ্যাচ্‌কাটানে যা উঠল এইখানে লিপিবদ্ধ করি। ১৯১২ সনের কথা বলছি। তখন Long vacationএর ছুটি, Cambridge থেকে Londonএ এসেছি। শুনলাম কবি একটা operation করে Chelseaতে একটি বাড়ীতে কিছুদিনের জন্য বিরামশয্যা আশ্রয় করেছেন। গেলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। গিয়ে দেখি একটা লম্বা আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে পা মেলে অর্ধশায়িত অবস্থায় বিশ্রাম করছেন। মনে হল বড় দুর্বল, আস্তে আস্তে কথা বলছেন। ইতিপূর্বে কেম্ব্রিজে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাই জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের কেম্ব্রিজ কেমন লাগল? স্মিতমুখে আমার দিক চেয়ে মৃদুস্বরে বল্লেন: হ্যাঁ, ভালই লাগল। দেখা হল অনেকের সঙ্গে, কিন্তু একটি লোকের কথা মনে হচ্ছে কেবল—আপনাদের বার্টি রাসেল—রাসেলের নাম উচ্চারণ করবামাত্র হঠাৎ যেন একটা তড়িৎ প্রবাহ তাঁর সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হয়ে গেল। তড়াক্‌ করে উঠে বসলেন সোজা হয়ে এবং উৎসাহদৃপ্ত মুখে বল্লেন, 'এক একটা কথা বলে যেন বুকে ঘুঁষি মারে', বলেই সেই সঙ্গে সজোরে মারলেন নিজের বুকে এক ঘুঁষি। ছোট্ট বন্ধ শয়নকক্ষ, জানালার সার্শী আঁটা। সেই

ঘুঁষির দমকে কাচের সার্শীগুলি ঝন্ ঝন্ করে উঠল। অবাক হয়ে দেখলাম তাঁর আনন্দোজ্জ্বল মুখশ্রী, শুনলাম উচ্ছ্বসিত ফোয়ারার কলকল্লোল। প্রাণবান মানুষ যখন জলজ্যান্ত মানুষের সংস্পর্শ পায়, সে দৈব মিলন হয় এমনি প্রাণোচ্ছল। সিংহের সঙ্গে সিংহের হয়েছিল কোলাকুলি। সেই স্মৃতি মনে জাগ্‌বামাত্র উদ্বেলিত হয়ে উঠল পুরুষসিংহের ক্ষণোদ্দীপ্ত উল্লাস-নর্ম।

বাস্তবিক, রবীন্দ্রনাথের জীবনের বড় একটা ট্রাজেডি বোধ হয়, 'ব্রব্‌ডিগ্‌নাগ্' হয়ে আমাদের মত লিলিপুটিয়দের মধ্যে বসবাস করা। কার সঙ্গে হবে তাঁর অন্তরের মিতালি, চিন্তা ভাব ও স্বপ্নের বিনিময়? ক্ষুদ্রতা সঙ্কীর্ণতা ভীরুতা হিংসা দ্বেষ দলাদলির মধ্যে যারা শতপাকে জড়িয়ে আছে, তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার অবকাশ কোথায়? ইউরোপে মনস্বী ও মহাপ্রাণ লোকের সংস্পর্শে আসার আনন্দ তাঁকে যে প্রতীচ্যের তীর্থযাত্রায় বারবার আকর্ষণ করেছে তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। কবির বিশ্বভারতী পরিকল্পনার মূলে রয়েছে গণ্ডীবন্ধনহীন উদার অসাম্প্রদায়িক মনীষার সঙ্গে নিখিলমৈত্রী-পিপাসু প্রেমপ্রবণ হৃদয়। তাই প্রেমানন্দে গেয়েছেন :

'কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই।'

কদিন আগে গিয়েছিলাম রাঁচিতে, একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে। সেখানে রবীন্দ্রজন্মোৎসবে হাজিরা দেবার হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে আমার এক গীতকুশলী আড়কাটি নাতিকে যে তিনটি গান ঘুঁষ দিয়ে এসেছি, তারই একটি উদ্ধৃত করে আজ কবির জন্মদিনে তাঁর উদ্দেশে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।

তোমার সোনার সংসার তুমি কবি,
অস্তাচলেব রবি।
ক্ষুদ্র কালের মাপে
বরষের ধাপে ধাপে
এ অশীতিতম কনকশিখর পরে
হেরি শাশ্বত তব যৌবন ছবি ॥
তব হিমগিরি হ'তে
বহে অনাবিল স্রোতে
আশা ভালবাসা করুণার পূতধারা,
সীমার মাঝারে সীমা বন্ধনহারা,
সুরধুনীতটে ছায়া ঘন কী অটবী ॥
রুদ্র মধুর সুললিত তব বাণী
বিষাণে বেণুতে জাগরণ দেয় আনি
ফুলে ঋতুরাজ, নটরাজ তাণ্ডবে,
পার্থ-সারথি সংগ্রামে বিপ্লবে,
তুমি ও কবিতা শিব সনে ভৈরবী ॥

শিবনাথ শাস্ত্রী

বিজ্ঞানীর চোখে জীবনটা 'হেরিডিটি' আর 'এনভায়রনমেণ্ট' দিয়ে গড়া। পিতৃপুরুষের উত্তরাধিকারলব্ধ শক্তি ও প্রবণতা এবং সেই সঙ্গে পরিস্থিতির প্রভাব—এই দুই উপাদানে জীব-মাত্রই ক্রমাভিব্যক্তির পথে আপনার বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে চলেছে বংশপরম্পরায়। কেবল মানুষের জীবনে দেখি অপরাপর জীবের সঙ্গে সে নৈসর্গিক এই দুই নিয়মের বশবর্তী হয়েও, স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে আত্মপ্রচেষ্টায় নিজ ব্যক্তিত্বের মূলধনটি চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়িয়ে চলেছে এবং সেই সঙ্গে পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলটিকেও আত্মসৃষ্টির অনুকূল ক'রে গড়ে তুলেছে। মানুষের মধ্যে নরোত্তম যাঁরা তাঁদের জীবনে এই আত্মসৃজনলীলা বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট। আপনাকে ভেঙেচুরে নতুন ক'রে গড়ে তোলবার অতন্দ্রিত সাধনায় শিবনাথ ছিলেন স্বয়ংস্রষ্টার এক-জন। কঠোপনিষদে একটি বচন আছে

> বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।
> সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥

শিবনাথ সারথির মত আপনার মনকে জ্ঞান ও ধর্মের পথে প্রবর্তিত করেছিলেন দুর্জয় ইচ্ছাশক্তির বলে, যে-পথ সাধককে উপনীত করে ব্রহ্মচরণে।

কবি শিল্পী আত্মপ্রকাশ করেন নিজের রচনায়। এই রচনার ক্ষেত্র শুধু কাব্যশিল্পে আবদ্ধ নয়। প্রতিদিনের কর্মে আচরণে স্বজনে নির্জনে অন্তরের সংগোপনে এর উদার প্রসার। অনেকের জীবনেই এটা পতিত জমি হয়েই পড়ে থাকে, কেউ কেউ সোনার ফসল ফলান। শাস্ত্রীমহাশয় জ্ঞানে প্রেমে কর্মৈষণায় ও আত্মোৎসর্জনে জীবনটিকে ফলিয়ে তুলেছিলেন সেই সোনার ফসলে।

তিনি আমার পিতৃবন্ধু ছিলেন। আশৈশব তাঁকে পেয়েছিলাম। তাঁকে কাকাবাবু বলে ডাকতাম। তিনি আমার পিতৃব্য ও গুরুতুল্য ছিলেন।

ছেলেবেলায় ছিলাম দুরন্ত আর লেখাপড়ায় ছিল না বিতৃষ্ণার অন্ত। শাসনে হ'ত উল্টো ফল। শাস্ত্রীমহাশয়ের কাছে পেতাম স্নেহের অনুশাসন। এক দিনের জন্যেও খাই নি কখনও বকুনি। ভোরবেলায় সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছেন কতদিন প্রাতর্ভ্রমণে। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের ব্রাহ্মপাড়া থেকে কোন দিন হাওড়ার পোল পর্যন্ত, কোন দিন বা ইডেন গার্ডেনে, ঘোড়দৌড়ের মাঠে। পথে চলতে চলতে গল্প হ'ত, প্রশ্নোত্তরের ভিতর দিয়ে আমার অজ্ঞাতসারে কত শিক্ষা ও প্রবর্তনা দিতেন। আমার প্রায় প্রত্যেক জন্মতিথিতে তিনি এসে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বসতেন ব্রহ্মোপাসনায়। উপাসনান্তে দিতেন উপদেশ, অতি সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। শুধু ভাবাবেগে ত জীবন গঠিত হয় না। চাই সজাগ আত্মদৃষ্টি,

নির্মম আত্মশাসন, অক্লান্ত সাধনা। এ সংসারে কেউ কারু হিতসাধন করতে পারে না, স্বয়ং ভগবানও হার মানেন, যদি আত্মোন্নতির চেষ্টা অন্তর থেকে না জাগে। বাহিরের আনুকূল্যে প্রয়োজন আছে, কিন্তু সেটা হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় হ'লেও চলে যদি অন্তঃপ্রকৃতি স্বেচ্ছায় তার বশবর্তী হয়। জীবনে যা ব্যর্থ হয়েছে আত্মাপরাধে, সেকথা বলবার স্থান এ নয়, কিন্তু জীবনে যে অমূল্য দান পেয়েছি আচার্যদেবের কাছে সে কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করলে এ মৌখর্যে কোন প্রত্যবায় হবে না।

লোকের কথা বা পুঁথিগত বিদ্যা মনের উপর দিয়ে অধিকাংশ সময়েই ভেসে যায়, ভিতরে বড় একটা তলায় না। ব্যক্তিবিশেষের সংস্পর্শের একটা আশ্চর্য প্রভাব আছে, তার স্মৃতি অমর হয়ে থাকে অন্তস্তলে। শাস্ত্রীমহাশয়ের সঙ্গে যাঁর দুদণ্ডের জন্যে পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়েছিল এমন অনেকের সঙ্গে এই দীর্ঘজীবনে আমার কথাবার্তা হয়েছে। দেখেছি, এঁরা কেউ তাঁকে শুধু ভুলতে পারেন নি তা নয়, শিবনাথের ব্যক্তিত্বের যে বৈশিষ্ট্য, তারও একটা ছাপ এঁদের মনে রয়ে গেছে। সেটা এক কথায় বলতে গেলে, বোধ করি তাঁর স্বচ্ছ সরল প্রকৃতির অকৃত্রিমতা এবং আত্মঘোষণাশূন্য নিষ্কাম প্রেমের চৌম্বকশক্তি।

মনে পড়ে একবার কৈশোরে গিয়েছিলুম ভোলাগিরি দর্শনে, প্রেসিডেন্সী কলেজের কতগুলি ছাত্রের সঙ্গে। তাঁদের

একজনকে দাদা বলে ডাকতাম, তিনিই আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। স্বামীজী বড়বাজারের গলির ভিতর এক শিষ্যের বাড়ী আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। তখন হ্যারিসন রোড তৈরী হচ্ছে, অনেক ইমারতের ধ্বংসস্তূপ ভেদ ক'রে। তিনতলার একটি লম্বা ঘরের প্রান্তে সন্ন্যাসীঠাকুর ব'সে আছেন। হাস্যোজ্জ্বল মুখশ্রী, পরনে একটা সাদা আলখাল্লা, গেরুয়া নয়। আমরা প্রণাম করে তাঁর কাছে বসলাম। সহজ সুবোধ্য হিন্দিতে তিনি আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন, উপদেশের ছিটেফোঁটা নেই তাতে। এমন সময় দেখি, একটি জটাগৈরিকধারী সাধুবাবা তাঁর পাশে করজোড়ে ব'সে আছেন এবং থেকে থেকে একটু অধীর ঔৎসুক্যের সঙ্গে বলছেন, 'গুরুজি কুছ্ উপদেশ দি জিয়ে।' ভোলাগিরি তার কথায় কর্ণপাত না করে আমাদের সঙ্গে নানা প্রশ্নোত্তরের মালা গেঁথে চলেছেন, বারবার উক্ত সাধুবাবার নির্বন্ধাতিশয়ে বিচলিত হয়ে একবার তার দিকে চকিত কটাক্ষপাত ক'রে বললেন, 'আরে বাবা! মন গেরুয়া কর্না।' গৈরিক-বেশীকে মন গেরুয়া করার কথাটা, সেই গৈরিক বহ্নিধ্বজার উপর নির্বাপণী এক কলসী জলধারার মত পড়ল। লোকটার পাংশুমুখের ছায়ায় তার লাল্চে গেরুয়াটা হয়ে গেল ছাইমাখা আমাদের চোখে। উপদেশটা কিন্তু হয়েছিল মোক্ষম্। ফিরে আসবার পথে আমার মনে হয়েছিল আচার্য শিবনাথের কথা। সত্যই তাঁর মনটা ছিল বৈরাগ্যে গৈরিকরঞ্জিত,

বাহিরে ছিল না তার চিহ্ন-লেশ। মহাদেবের মতই শিবনাথ ছিলেন ভোলানাথ। সাংসারিকতার নির্মোক সহজেই খসে পড়েছিল তাঁর বহির্জীবনে, আপনার অজ্ঞাতসারেই করতেন আত্মদান। রূপসী তার রূপ হারায় প্রসাধনের আতিশয্যে, আত্মবিঘোষণায় জাগে নটীপনা। পণ্ডিত পাণ্ডিত্যের অভিমানে যখন হারান বিছ্যার শ্রেষ্ঠ মাধুর্য বিনয় তখন লোকের চক্ষে হন মূর্খাধম। ধর্মাভিমানীর আত্মবিজ্ঞপ্তি ভগবৎ-প্রসঙ্গে জাগায় বেসুর। শাস্ত্রীমহাশয়ের উপাসনায় উপদেশে বক্তৃতায় উৎসারিত হ'ত তাঁর অন্তর্গঙ্গোত্রীর মুক্তধারা—অনাবিল স্বচ্ছ, অমৃতময়।

সামান্য ক্ষুদ্র একটি আচরণে ফুটে ওঠে মানুষের আসল স্বরূপটি। একটি ঘটনা আমার মনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমার পিতৃদেবের মৃত্যুর পর আমরা কিছুদিন মাণিকতলায় একটি বাড়ীতে থাকতাম। শাস্ত্রীমহাশয় প্রায়ই আসতেন আমাদের খোঁজখবর নিতে, অন্ততঃ ছু চার মিনিটের জন্যে। একদিন সকালে এসে উপস্থিত। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। আমাদের পৈত্রিক আমলের বৃদ্ধা বামুন-ঠাকুরাণী ও ঝি ছুইজনেরই জ্বর। মা রান্নাঘরে আমাদের জন্যে রান্না চড়িয়েছেন। শাস্ত্রীমহাশয় বললেন, 'ছেলেরা আজ কী খাবে?' আমরা ছুই ভাই অল্পদিন আগেই খুব ভুগে উঠেছি, মাছের ঝোল ভাত তখন পথ্য। মা বললেন, 'ওদের জন্যে ভাতে ভাত করে দিচ্চি, ঝি ত বাজার যেতে পারবে না।' রান্নাঘরের বাহিরের বারাণ্ডায় ছিল বাজারের

চুপড়ি আর থলি। শাস্ত্রীমহাশয় হেসে বললেন, 'আমি এক্ষুনি বাজার করে আনছি।' এই বলেই পায়ের প্যানেলা জুতোজোড়াটা চট্ ক'রে পায়ের সাহায্যেই, খুলে ফেলে থলি-চুপড়ি নিয়ে বাজারে রওনা হলেন। মা ত রান্নাঘর থেকে বাইরে ছুটে এসে ওঁকে রুখতে চান, কিন্তু কে শোনে কার কথা! কিছুক্ষণ পরেই শাস্ত্রীমহাশয় ফিরে এলেন, খালি পায়ে, বাঁ কাঁধে ধামা, ডান হাতে মাছের থলি। মা একটি কথাও বলতে পারলেন না। দর দর করে তাঁর চোখে জল পড়তে লাগল, ঘোমটা টেনে চোখ মুছলেন।*

শাস্ত্রীমহাশয় ছিলেন সদানন্দ পুরুষ ও কৌতুকপ্রিয়। বাবা আমাদের দুই ভাইএর নাম রেখেছিলেন নেপোলিয়ন

* লেখক শাস্ত্রীমহাশয়ের "আসল স্বরূপে"র দ্যোতক যে আচরণের উল্লেখ করিয়াছেন, শাস্ত্রীমহাশয়ের জীবনে এইরূপ আচরণের দৃষ্টান্ত অনেক দেখা গিয়াছিল। তাঁহার "আত্মচরিত" গ্রন্থে এরূপ কোন কোন ঘটনার উল্লেখ আছে। শাস্ত্রীমহাশয়ের প্রেরণায় তাঁহার সহাধ্যায়ী বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বিধবাবিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে যোগেন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন ও তাঁহার উপরে ভয়ানক নির্যাতন আরম্ভ হয়। এই সময়ে আমার গুরুতর শ্রম আরম্ভ হইল। যোগেন তাঁহার ভগ্নহৃদয়া মাতা ও আত্মীয়স্বজনকে লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন; ঈশানেরও পাঠ ও নাইটডিউটির হাঙ্গামাতে অবসরাভাব হইল। এদিকে চাকরচাকরাণী নাই; সুতরাং আমাকেই বাজার করা, তিন তলাতে কাঁধে করিয়া জল তোলা প্রভৃতি সমুদয় গৃহকর্ম্ম করিতে হইত। এই সকল স্মরণ করিয়া এখন আনন্দ হয়" (আত্মচরিত, শিবনাথ শাস্ত্রী পৃঃ ১২৪)।—প্রবাসীর সম্পাদক।

আর গ্যারিবল্ডি। দীর্ঘ অসুস্থতার পরে আবার সবল হয়ে দুই ভাই যখন উঠানে ছুটাছুটি করতাম কাকাবাবু তামাসা করে বলতেন, "ওই দেখ দুই বীরপুরুষ, 'যাই-যাই সিং' আর 'এখন-তখন সিং'।"

মনে পড়ে আমাদের পরমাত্মীয় স্বর্গীয় রামব্রহ্ম সান্যাল মহাশয়ের আলিপুরস্থ চিড়িয়াখানার ভবনে শাস্ত্রীমহাশয় বসেছেন মধ্যাহ্ন ভোজে। গ্রীষ্মের ছুটী তখন, আমরাও এসেছি সেই নিমন্ত্রণে। ভূরিভোজনান্তে শাস্ত্রীমহাশয়ের পাতে মাসীমা মস্ত একটি আম দিলেন। আমটি নিটোল শ্যামচিক্কণ, সহজেই মনকে লোভাতুর করে। শাস্ত্রীমহাশয় এক টুক্‌রো আম মুখে তুলেই ত সেটি ফেলে দিয়ে বললেন ঃ ও হেমন্তের মা, এ যে টকের বাবা! এবং তৎক্ষণাৎ এই ছড়াটি কাটলেন—(এই আমের প্রশস্তিতে)

'কাক দেশান্তর, বাঁদর বোবা,
হিঁদু রাম রাম, মুসলমান তোবা।'

আর তাঁর সেই অট্টহাস্য! পশুপক্ষী ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সেই আম্রফলটির অম্লরসের প্রভাব বির্ণনা শুনে আমরা সকলেই হেসে আকুল।

এদেশে ব্রহ্মবাদ কিছু নূতন তত্ত্ব নয়। উপনিষদের যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে মধ্যযুগের রামানন্দ, কবীর, দাদু, প্রভৃতি সকলেই অমূর্ত ব্রহ্মের উপাসনা ও অধ্যাত্মযোগের কথা

প্রচার করেছেন এবং সাধনরাজ্যের গভীরতম প্রদেশে উত্তীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু যে কারণেই হোক, সে প্রসঙ্গের আলোচনা অত্র নিষ্প্রয়োজন, সর্বভূতে যাঁরা ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, 'ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকোবিষ্ণুঃ' মোহমুদ্গরের এই গদাঘাতের শব্দেও তাঁদের বংশধরদের মোহনিদ্রা ভাঙে নি। জাতিভেদের খণ্ডতায় তারা ভারতবর্ষকে কিমামাংসে পরিণত করেছে, দেব-মন্দিরের দ্বার তথাকথিত হরিজনদের জন্যে হয়েছে অর্গলিত। তার ফল যা, সমস্ত হিন্দুস্থান তা আজ হাড়ে হাড়ে ভোগ করছে। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা যাঁরা করেছিলেন তাঁরা এমন কজন বেপরোয়া পুরুষ, যাঁরা অশাস্ত্র-শাসিত ও আচার-নিষ্পিষ্ট এই দেশে সর্বস্ব পণ ক'রে গৃহপরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে ভারতের সনাতন উচ্চ আদর্শগুলিকে হাতেকলমে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। এটা তাঁদের হাতে হয়েছিল একটা experimental farm—পরখ ক'রে দেখবার ক্ষেত্র। এ পরীক্ষায় ব্রাহ্মসমাজ উত্তীর্ণ হতে পারুন না পারুন, নব্য ভারতে এই 'ভাজি-উচ্ছে-বলি-পটোলে'র দেশে আদর্শগ্রস্ত সত্যসন্ধ দুচারটি মরিয়া লোকের কল্যাণে, মতের সঙ্গে আচরণের ঐক্যস্থাপনের এই নির্ভীক সংঘবদ্ধ প্রয়াসই ব্রাহ্মসমাজের বৈশিষ্ট্য। শাস্ত্রীমহাশয় সেই সর্বত্যাগী অকুতোভয় যোদ্ধাদের একজন ছিলেন। তাঁর প্রচারক-জীবনে গভীর অধ্যাত্মযোগের সঙ্গে কর্মযোগের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। হিমাদ্রিশিখরে যে তুষার সম্ভার পুঞ্জিত হয়

অন্তরীক্ষের প্রাণরস ঘনীভূত ক'রে, সেই হিমরাশি বিগলিত হয়ে নেমে আসে সহস্রধারায় উষরভূমিকে উর্বরতা দান করবার জন্যে। গ্রামারে দেখি আগে Verb 'to be' তার পরে Verb 'to do'—হওয়া আগে, করাটা পরে। আমরা অনেক সময়ে 'ভূ' ধাতুটাকে এড়িয়ে 'কৃ' ধাতুটাকে আশ্রয় করি, তাতে ধর্ম কর্ম দুইই হয় পণ্ডশ্রম। নিয়তি হেসে বলেন, 'মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি।' যুদ্ধকাণ্ডের আগে থাকে উদ্যোগপর্ব, একথাটা ভুলে যখন যাই তখন তিনি মনে করিয়ে দেন সব্যসাচীকে দ্রোণাচার্যের অস্ত্রপরীক্ষার আসরে, যাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত ছিল শরব্য শকুন্তের অক্ষিবিন্দুতে—আর সব থেকেও ছিল না সেই একাগ্র দৃষ্টির সম্মুখে।

ব্রাহ্মসমাজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর সেবায় শিবনাথ প্রাণপাত করে গেছেন। আমাদের অযোগ্যতায় শুষ্কতায় পঙ্কবাহুল্যে ব্রাহ্মসমাজ যদি আজ মরাগাঙে পরিণত হয়ে থাকে, সে ব্যর্থতা শুধু আমাদেরই, কিন্তু সে ধারা নূতন খাতে আপনার পথ কেটে নিয়ে অগ্রসর হবেই হবে। হচ্ছেও তাই। জাতিভেদের নিরাকরণ, স্ত্রী-স্বাধীনতা, বাল্যবিবাহের উচ্ছেদ প্রভৃতি যেসকল সামাজিক সংস্কারের উদ্বোধন হয়েছিল এই বাংলা দেশে ব্রাহ্মসমাজের মুষ্টিমেয় সত্যাগ্রহীর প্রাণপণ প্রযত্নে, আজ সেই সাড়া জেগেছে সারা হিন্দুস্থানে রাজনৈতিক উদ্দীপনায়, শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যবৃন্দের অপ্রমত্ত সেবাব্রতে, শ্রীঅরবিন্দের অন্তর্মুখী অধ্যাত্মসাধনার অনুপ্রাণনায়।

শাস্ত্রীমহাশয়ের অত্যন্ত প্রেমপ্রবণ ও অসাম্প্রদায়িক হৃদয় ছিল। কর্মক্ষেত্রের সংকীর্ণ সীমানার মধ্যে বাধ্য হয়ে আবদ্ধ থাকলেও বিশ্বমৈত্রী ছিল তাঁর মজ্জাগত। যেখানে সদ্‌গুণ দেখেছেন জাতিসম্প্রদায় নির্বিশেষে তাঁদের বরণ করেছেন উদার প্রেমের অঙ্গীকারে।

১৮৮৮ সালে তিনি স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাসের সঙ্গে মাস ছয়েকের জন্যে বিলেতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে বক্তৃতায় আলোচনায় গল্পে ইংরেজ জাতির সদ্‌গুণাবলীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন। তিনি স্ত্রী-স্বাধীনতার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। বিলাতের ভদ্র গৃহস্থকন্যারা কিরূপ শ্রমশীলা, শুদ্ধচরিত্রা, আত্মরক্ষায় অটল এবং পুরুষের শক্তিরূপিণী বলতে বলতে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতেন। সেকথাগুলির প্রতিধ্বনি আজও আমার মনে জাগে। আপামর সাধারণের সময়ানুবর্তিতা, সততা, মিতভাষণ, আচরণের সংযম, জীবনে স্ফূর্তির প্রাচুর্য প্রভৃতি গুণের কথা তাঁর মুখে অনেক শুনেছি। মন্দ নেই কোথায়? সেসম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করতেন এবং আমাদের সতর্ক হতে বলতেন, যেন পাশ্চাত্য বহিশ্চাক্‌চিক্য ও বিলাসোপকরণে বিভ্রান্ত না হই।

যথার্থ দেশপ্রেমিক ছিলেন তিনি। কিন্তু দেশসেবার বনেদ যে সত্যনিষ্ঠা ও চরিত্রের উপর, সে সম্বন্ধে তাঁর বাণী অবিনশ্বর। তাঁর 'পুষ্পমালা' গ্রন্থে 'উৎসর্গ' শীর্ষক একটি কবিতা আছে। স্বদেশপ্রেমের এই অপূর্ব কবিতাটি বাংলা

ভাষায় অতুলনীয়। কবি শিবনাথের পদলালিত্য, মর্ম্মবাণী, ভগবৎপ্রেম, স্বদেশপ্রীতি ও নৈতিক আদর্শ এর ছত্রে ছত্রে। দু একটি অংশ উদ্ধৃত করি।

চাই না সভ্যতা চাষা হয়ে থাকি,
দাও ধর্ম্মধন প্রাণে পূরে রাখি।
হায় জন্মভূমি! পুণ্যভূমি তুমি,
দাও পুণ্যবারি দগ্ধ প্রাণে মাখি।
তুমি যার তরে খ্যাত এ সংসারে
আন সে বিশ্বাস তাই লয়ে থাকি।
সভ্যতা সভ্যতা ক'রে লোকে ধায়
কই তাতে সুখ, মরীচিকা প্রায়
প্রতি পদে দূরে ওই যায় স'রে
তোমার সন্তানে ওই দিল ফাঁকি।

* * *

দেখে হাসি পায় ভারতের জয়
গাইলেন কবি,—নবোৎসাহময়,
না ফুরাতে গান পশুর সমান
আবার নরকে নিলেন আশ্রয়।
ওরে বঙ্গবাসি তোদিগে জিজ্ঞাসি
এরূপে কি হবে ভারতের জয়?
ছাড় সে কল্পনা, তাহাতে হবে না,
বৃথা কেন কর সে সুখ বাসনা!
ইন্দ্রিয়ের দাস যেবা বারমাস
দেশের উদ্ধার তার কর্ম্ম নয়।

ওরে, পতিব্রতা বিধবা হইয়ে
যেরূপেতে থাকে ব্রহ্মচর্য্য লয়ে,
আয় সে প্রকার থাকি শুদ্ধাচার
মৃত স্বাধীনতা ধনে উদ্দেশিয়ে।
যদি দিন আসে তবে রে উল্লাসে
নাচিব গাইব সকলে মিলিয়ে।
যত দিন নাহি সেই দিন আসে,
থাক্ অমানিশি ভারত-আকাশে ;
আশার সলিতা রাবণের চিতা
জ্বালায়ে সকলে থাকি রে বসিয়ে।
আমি বড় দুঃখী তাতে দুঃখ নাই,
পরে সুখী ক'রে সুখী হতে চাই
নিজে ত কাঁদিব কিন্তু মুছাইব
অপরের আঁখি, এই ভিক্ষা চাই।
সত্য।—ধনমান চাহে না এ প্রাণ—
যদি কাজে আসি তবে বেঁচে যাই ;
বহু কষ্টে পূর্ণ আমার অন্তর,
এই আশীর্ব্বাদ কর হে ঈশ্বর !
খাটিতে বাঁচিব খাটিয়া মরিব
এই বড় আশা, পূর্ণ কর তাই।

জীবনের গভীরতম অনুভূতিগুলিকে প্রকাশ করবার তাগিদে মানুষ তার ভাষাকে দিয়েছে ছন্দ এবং সুর, যাদের আনুকূল্যে অনির্বচনীয় ফোটে বচনমাধুর্যে, বাক্য উত্তীর্ণ

হয় বচনাতীতে। শিবনাথ জন্ম-কবি। অতি শৈশবেই তাঁর কবি-প্রতিভার উন্মেষ হয়। তাঁর উৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য 'নির্বাসিতের বিলাপ' সতের বৎসর বয়সে লিখিত। তাঁর কাব্য ও উপন্যাস বঙ্কিমযুগের। সমসাময়িক রচনায় শিবনাথের কাব্যবৈদগ্ধ্য কত উচ্চে ছিল সে কথা বঙ্কিমচন্দ্র লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর 'বঙ্গদর্শনে'। শিবনাথের আজীবনের ঐকান্তিক বাসনা তাঁর 'পুষ্পাঞ্জলি' পুস্তকের 'এ মোর কামনা' শীর্ষক কবিতায় বাণীমূর্তি নিয়েছে এবং আমরণ আপনাকে বিকীরিত করেছে "রেডিয়ামে"র স্বতোনিষ্যন্দী অজস্র বৈদ্যুত কণার বদান্য বিতরণে। এই কবিতাটির থেকে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করে আমার বক্তব্য শেষ করি।

আমি হব মধু বিন্দু; জগৎ খাইবে;
অণু অণু করি বিলাইবে;
হারায়ে মিশায়ে যাব, নিজে না সন্ধান পাব
বন্ধুজনে খুঁজে বেড়াইবে;
ঘরে ঘরে দেখিতে পাইবে।
মিছরির কুঁদো হব; তিল তিল করে
দশে লয়ে যাবে ঘরে ঘরে;
সূত্র মাত্র সার হয়ে, রহিব এ দেহ লয়ে,
যত শক্তি শরীরে অন্তরে,
সব যাবে জগতের তরে।
আমি রে চন্দন হব; জগৎ আমায়
পিষে চূর্ণ করিবে শিলায়;

কঠিন রব না আর, হইব তরলাকার
হৃদে তুলে লবে যে আমায়
তার যেন পরাণ জুড়ায়।
আতরের শিশি হব ; লইয়া আমারে
আছাড়িয়া ভাঙিবে বাজারে ;
শিশু দলে কোলাহলে তিলে তিলে লবে তুলে
চুলে চুলে যাব দ্বারে দ্বারে,
গন্ধভার বিতরি সংসারে।

শরৎ স্মৃতি

প্রত্যেক শিল্পী ও স্রষ্টা তাঁর জীবনের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকে আপনার দেহাতিরিক্ত একটি সত্তা দান করেন নিজ রচনার মধ্যে। স্বল্পায়ু জীবনে যেটুকু শাশ্বত, তা এমনি করেই মৃণ্ময় দেহীকে অতিক্রম ক'রে তার চিন্ময় স্বরূপটিকে মানবের ইতিহাসে চিরঞ্জীব করে। শরৎচন্দ্র তাঁর আত্মিক মূর্তির কিয়দংশ তাঁর অমর রচনার মধ্যে লিপিবদ্ধ করে গেছেন উচ্চ শ্রেণীর কথাশিল্পী হিসাবে। তাঁর লেখা আমাদের ঘরে ঘরে রইল, কিন্তু তিনি আর নাই। তাঁকে হারিয়ে আমরা শোকাকুল হয়েছি। এ শোক সেই পরিমাণে গভীর যে পরিমাণে তিনি আমাদের হৃদয়কে আকৃষ্ট করেছিলেন। ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রকে জগৎ হারাল তাঁর রচনার সমাপ্তিতে। কিন্তু মানুষ শরৎচন্দ্রকে যাঁরা হারালেন তাঁদের শোক নৈর্ব্যক্তিক নয়, তাঁরা নিজ নিজ আত্মীয়তার অনুপাতে ব্যক্তিগত হিসাবেই আজ শোকার্ত।

সতীদেহ স্কন্ধে নিয়ে যখন মহাদেব উন্মত্তের মত ত্রিভুবন ঘুরে বেড়ান তখন নারায়ণ তাঁর চক্রে সতী-শব খণ্ডিত ক'রে দিকে দিকে নিক্ষেপ করলেন। সেই সব খণ্ডাংশ যেখানে যেখানে পড়ল সেই স্থানগুলি পরিণত হল মহাপীঠে বা উপপীঠে। শরৎচন্দ্রের পার্থিব জীবনের ছিন্নাংশগুলি নানা

দেশে নানা কালে বহু নরনারীর হৃদয়ে হৃদয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। আজ সেই সেই স্থান ও ব্যক্তিগুলি শোকার্ত বাংলার স্মৃতিপীঠ। যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদের মুখে তাঁর কথা শোনবার জন্যে আমরা ব্যাকুল হয়েছি।

১৩৪২ সনের ৩১শে ভাদ্র শরৎচন্দ্রের বার্ষিক জন্মোৎসবে Indian State Broadcasting Stationএ 'শরৎ শর্বরীতে' পৌরোহিত্য করবার জন্যে আহূত হয়েছিলাম, সকলের সঙ্গে এক হৃদয় হয়ে তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করবার উদ্দেশে। আমাদের সে সমবেত প্রার্থনা বিধাতা পূর্ণ করলেন না। সেদিন বন্ধু হিসাবেই আমার ডাক পড়েছিল। আজ আন্তরিক প্রেরণাতেই আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করবার জন্যে অগ্রসর হয়েছি।

বিশ বৎসর পূর্বেকার কথা। তখন আমি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজের অধ্যাপক। শরৎচন্দ্র থাকতেন বাজেশিবপুরে। ইস্কুলমাষ্টারের সঙ্গে বাংলার জাতীয় জীবনের ষ্টেজমাষ্টারের সঙ্গে পরিচয় হল। এই খাঁচার পাখীর সঙ্গে বনের পাখীর সেই অকৃত্রিম সৌহার্দের দিনগুলি আমার স্মৃতিতে অমর হয়ে আছে। প্রায় প্রতিসপ্তাহেই তিনি আমার কাছে আসতেন। ছুটির দিন বেলা দুপুর থেকে রাত দুপুর পর্যন্ত মাঝে মাঝে আমাদের আড্ডা জমত। মনে পড়ে সমস্ত দিনব্যাপী গল্প তর্ক রসচর্চার পরে অফুরন্ত কথার জের টানতে তাঁর বাসা পর্যন্ত পৌঁছে 'ভেলি'র ঘেউ ঘেউ মুখরিত

সাদর সম্ভাষণ শুনে, মন্থর চরণে সারা দিনের আলোচনার স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে গভীর রাত্রে ঘরে ফিরেছি। বেশীর ভাগ কথাবার্তা হত সমাজ সংস্কার, প্রেমতত্ত্ব, নূতন পল্লী সংগঠন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। একজন মাড়োয়াড়ী নাকি দু'লাখ টাকা তাঁর হাতে দিতে চেয়েছিলেন নবপল্লী সৃজনকল্পে। তাই নিয়ে আমাদের দু'জনে অনেক জল্পনা-কল্পনা চলত। জানিনা সে বিষয়ে আর কারুর সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হয়েছিল কি না। এই সব আলোচনার ভিতর দিয়ে তাঁর অন্তরের একটা স্বপ্ন-লোকের সৃষ্টিনীহারিকা আমার চোখে ফুটে উঠত। আলাদীনের দীপের দৈত্যকে যদি সেই সময়ে আমরা হাতে পেতাম তাহলে এই ম্যালেরিয়াপ্রপীড়িত বাংলা দেশে একটা অপূর্ব পল্লীর যে উদ্ভব হ'ত তার সন্দেহ নেই। তবু মনে হয় তাঁর সে পল্লী-পরিকল্পনা একদিন সফল হবে।

শরৎচন্দ্রের কাছে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানা জীবনের বিচিত্র কাহিনী শুনেছি। তাঁর কোনো কোনো উপন্যাসে বর্ণিত আখ্যায়িকার মূল সত্য ঘটনাগুলির কথা অনেক সময়ে আমাকে বলতেন। জাতিভেদ প্রথার বিকৃতি আমাদের দেশে কি ভীষণ আকার ধারণ করেছে সে সম্বন্ধে তাঁর বহু অভিজ্ঞতার বৃত্তান্ত শুনেছি। উঁচু নীচুর ভেদ যদি ন্যায় ও সত্যাশ্রয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত না থাকে তাহলে সমাজের কী দুর্গতি হয় আন্তরিক বেদনার সঙ্গে সেই সব অত্যাচার ও ব্যাভিচারের ব্যাখ্যা করতেন। বাংলার অনেক গণ্ডগ্রামে গৃহস্থের বাড়ী

অতিথি হয়ে তিনি বহু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। একদিন দিব্যি মরক্কো বাঁধানো একটি নতুন খাতায় লিখিত 'বামুনের মেয়ে'র পাণ্ডুলিপির প্রথমাংশটি আমাকে শুনিয়ে বলে গেলেন: এবার একখানা নাটক লিখছি। কিছু দিন পরে এসে বল্লেন: নাঃ, নাটক আর হোলো না, ওটাকে নভেল করতে হল। বইখানি বাহির হতেই একখানি আমাকে উপহার দিয়ে গেলেন। যে সব সত্য ঘটনা অবলম্বনে এই উপন্যাসটি লিখিত তার অনেক কথা ইতিপূর্বেই শরৎচন্দ্রের কাছে শুনেছিলাম। এই বইখানি লেখার জন্যে কত বেনামি চিঠিতে গালাগালি উপঢৌকন ডাকে আসত মাঝে মাঝে সে সংবাদ আমাকে দিয়ে যেতেন।

সহানুভূতির তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি তাঁর ছিল, তাই তিনি ছিলেন মানব চিত্তের ডুবুরি। ভূ-তত্ত্ববিৎরা বলেন, একদিন যা ছিল শ্যামঘন অরণ্য তারি দগ্ধাবশেষ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে ভূগর্ভের অঙ্গার স্তূপে। বিপুল চাপে নিষ্পিষ্ট অঙ্গার জলকণার সহিত মিলিত হ'য়ে পরিণত হয় স্ফটিকস্বচ্ছ হীরকে। বহু বেদনার দহনে ও পেষণে মানুষের হৃদয়েও বুঝি কয়লার খনির মধ্যে হীরা ফোটে। অন্তর্জগতে অভিজ্ঞ খনক শরৎচন্দ্র এই হীরার সন্ধান পেয়েছিলেন। তাঁর সৃষ্ট নারীচরিত্রে হীরকদীপ্তি আছে কি না, সাহিত্যের জহুরী যাঁরা তাঁরা পরখ করে দেখবেন। তবে আমি তাঁর কথাবার্তায় আলোচনায় যে সত্যটি লক্ষ্য করেছি সেটি হচ্ছে নারীত্বের প্রতি তাঁর অকপট

শ্রদ্ধা এবং সেই শ্রদ্ধান্বিত দৃষ্টিতে হিন্দুনারীর একটি বিশিষ্ট রূপ ফুটেছে তাঁর রচনায় যার মৌলিক প্রতিকৃতি বঙ্গগৃহে দুর্লভ নয়। 'স্বরাজ সাধনায় নারীর স্থান' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ তিনি আমার অনুরোধে শিবপুর কলেজের ছেলেদের সমিতির জন্যে লিখেছিলেন। সে সময়কার 'নব্যভারত' পত্রিকায় সেটি প্রকাশিত হয়েছিল।

সরকারী চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করবার পর তাঁর সঙ্গে বেশী দেখাশুনা হবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমি কূপমণ্ডূক, তিনি আমাকে টেনে এনে এই 'রবিবাসরের' সভ্য করেছিলেন। সন্ধ্যার সময় একদিন তেতলার ছাদে বসে আছি এমন সময়ে

'গ্রামে গ্রামে সেই বার্ত্তা রটি গেল ক্রমে
মৈত্র মহাশয় যাবে সাগর সঙ্গমে।'

এই লাইন দুটি আবৃত্তি করতে করতে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে কে আসছে শুনতে পেলাম। হাঁফাতে হাঁফাতে শরৎচন্দ্র আমার কাছে এসে আমার হাতখানা ধরে টানতে টানতে বল্লেন: উঠুন, এখনি যেতে হবে। আমি হেসে বল্লাম: সাগর সঙ্গমটি কোথায়? বসুন, বসুন, আগে একটু দম নিন।

তাড়াতাড়ি একখানা চেয়ার এনে তাঁকে বসতে দিলাম। শুনলাম, 'মিলনী' সমিতিতে তাঁর সভাপতিত্বের ডাক পড়েছে, তাঁর সঙ্গ নিতে হবে এবং আমাকেও কিছু বলতে হবে। আমি বল্লাম: এ যে দেখছি উল্টো চাপ, এবার মৈত্রের জন-

সমাধির ব্যবস্থা। তা হচ্ছে না, যদি প্রতিশ্রুতি দেন আমাকে কিছু বলতে হবে না, তবে সানন্দে যাব, নচেৎ নয়। গেলাম তাঁর সঙ্গে। ঘটনাটি কিছুই নয়, তবু সেদিনকার আলোচনা সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে ফিরবার পথে যে কথাগুলি হয়েছিল তা ভুলব না।

তাঁর 'পাণিত্রাসের' বাংলায় নিয়ে যাবার কথা মাঝে মাঝে বলতেন। আমি বলতাম Hydrophobia (জলাতঙ্ক) হবে না ত? হেসে বলতেন 'জলজ্যান্ত তপ্‌সিমাছ খাওয়াব।' বৎসরাধিক হল একদিন দুপুর বেলা আমার তিনতলার উপর এসে উপস্থিত, একহাতে তাঁর বাগানের এককাঁদি কলা, আর এক হাতে একটা তপ্‌সে মাছের পুঁটুলি, অন্তত সের চারেক হবে ওজনে। অত বড় তপ্‌সি মাছ এ জীবনে দেখিনি। সাহিত্য সম্রাটের এই সহজ সরল বন্ধুবৎসল চিত্রটি আমার স্মৃতিতে চির মুদ্রিত হয়ে রইল। মথুরার কৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে ফিরেছিলেন, হয়ত বা শ্রীদাম সুবলদের জন্যে এমনি করেই রাজভোগ ছাঁদা বেঁধে এনেছিলেন, অকৃত্রিম স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ।

আমাদের সকলের অন্তরেই একটি সমাধি-প্রাঙ্গণ আছে। অনেক প্রিয়জনের স্মৃতিভস্ম সেখানে সযত্নে রক্ষিত। প্রত্যেকটি কবরের শুভ্র মর্মর ফলকে প্রেমাস্পদের প্রিয় নামটি খোদা। আর একটি নূতন সমাধিপ্রস্তরে সুহৃদ্বর শরৎচন্দ্রের নামটি লিখলাম। তাঁর চিন্ময় মূর্তিটি সেই সমাধির উপর রইল সমাসীন।

প্রমথ চৌধুরী

উৎসব ব্যাপারের একটা মাধ্যাকর্ষণ আছে। বিশেষতঃ যদি সে আয়োজনের সঙ্গে নাড়ীর যোগ থাকে। নিতান্ত আনাড়ীরও নাড়ী আছে, তা তার স্পন্দনটা কব্‌রেজ মশায়ের আঙুলের ডগায় যতই বেখাপ্পা লাগুক। সাহিত্যিক বলতে যা বোঝায় কস্মিন্ কালেও তা ছিলাম না। কিন্তু মানুষ মাত্রেই তার মগ্নচৈতন্যে রসলিপ্সু। রসাত্মক বাক্য শুনলেই কান খাড়া করে। একদা চৌধুরী মহাশয়ের 'সবুজ পত্রে'র মধুমর্মর আমাকে উৎকর্ণ করেছিল, তাই শ্রবণমাত্রেই হয়েছিলুম উক্ত পত্রিকার গ্রাহক। যে দেশে প্রায় সবাই কাঁঠাল কিলিয়ে এঁচোড়ে পাকা, অপিচ, গ'লে হয় ঝাঁঝালো, তত্র 'সবুজ পত্রে'র পরমায়ু আর থাকে কতদিন? শুকিয়ে পড়ল ঝ'রে। আমার মনে তার স্মৃতি রইল অমর হয়ে।

তারপর মনে পড়ে প্রমথবাবুর 'চার ইয়ারি-কথা'র গল্প চতুষ্টয়। বহুদিন বইখানি যক্ষের ধনের মত রক্ষা করেছিলুম। তারপর হারালুম, যেমন অনেক প্রিয় জিনিষকেই হারাতে হয়েছে দীর্ঘজীবনে। 'বীরবলের হালখাতা'র রচয়িতা ও 'চার ইয়ারির' চতুর্মুখ প্রবীন প্রমথবাবুর সম্বর্দ্ধনার বার্তা যখন কানে পৌঁছল তখন অবচেতনার মধ্যে জেগে উঠল একটা কলকল্লোল।

হাওয়া-আফিস থেকে প্রত্যহই একটি ভারতবর্ষের মানচিত্র প্রকাশিত হয়, তাতে সমবায়ুচাপের স্থানগুলি থাকে রেখাবন্দী। সাধারণত এই রেখাগুলি ছড়ানো থাকে এলোমেলো হয়েই। কিন্তু দেখা যায়, যদি কোথাও একটা ঝঞ্ঝার সূত্রপাত হয়, অমনি তারা কুণ্ডলী পাকাতে আরম্ভ করে, সেই আসন্ন ঝটিকার পীঠস্থানটিকে সমকেন্দ্রিক বৃত্ত-পরম্পরায় ঘিরে। এই সাইক্লোন কেন্দ্রটির থেকে যত দূরে যাওয়া যায়, বায়ুর চাপ তত উত্তরোত্তর বাড়তে বাড়তে অবশেষে নির্ঝঞ্ঝাট ঔদাসিন্যের মধ্যে সহজ প্রশান্তি লাভ করে। সুতরাং ঝড়ের কেন্দ্রকে ঘিরে বাতাসে যেন একটা মণ্ডলাকার গ্যালারীর সৃষ্টি হয়, ঊনপঞ্চাশ বায়ুর পল্টন সেই চক্র-সোপানাবলীর ধাপে ধাপে হুড়মুড় ক'রে নেমে আসে ঝঞ্ঝাবর্তের মধ্যবিন্দুতে। প্রমথবাবুকে কেন্দ্র ক'রে আজ বাংলার সাহিত্যরসিকদের অন্তরে এই রকম একটা উৎসব আন্দোলনের ঝঞ্ঝাবাত্যা জটলা পাকিয়ে তুলেছে তাঁর ভক্তবৃন্দের মণ্ডলপরম্পরায়। সেই শ্রদ্ধাবলয়িত বৃত্তনিচয়ের প্রান্তিক রেখাচক্রে আমার মত অসাহিত্যিক অথচ সাহিত্যানু-রাগী লুব্ধবৃন্দ বাঁধা পড়েছে। তাই 'রূপ ও রীতি'র কর্মকর্তা শ্রীমান ফণীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে আমার এই শ্রদ্ধাঞ্জলি চৌধুরী মহাশয়ের উদ্দেশে নিবেদন করি।

বহু বৎসর আগে 'হুতুম প্যাঁচার নক্সা'য় দেখেছিলাম যে পূর্বরাগ চল্‌তি ভাষার অনুদিত প্রাতঃসূর্যে, সেটা বাংলার

কথা ও প্রসঙ্গসাহিত্যের আকাশ ভ'রে ফুটে উঠল, সবুজ পত্রে'র পূর্বাহ্ণে এবং তার মধ্যে দেখেছিলাম 'জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং' প্রমথবাবুর প্রতিভাদীপ্ত দিব্যকান্তি। আর সেই সঙ্গে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে'র ধারাবাহিক বিস্ময়সৃষ্টি ও অতুল গুপ্তের অতুলনীয় প্রবন্ধাবলি। আমরা ইঙ্গবঙ্গ যুগের লোক। আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলটা স্বদেশীয় হ'লেও মনটা ছিল বিদেশীসাহিত্যপুষ্ট। এই পুষ্টি পরিপাক লাভ ক'রে কি অপূর্ব শক্তি ও শ্রী লাভ করতে পারে তা প্রত্যক্ষ করেছিলাম প্রমথবাবুর রচনায়। যে খেলতে পারে সে ফুটো কড়ি দিয়েও করে বাজিমাৎ। বাংলা ভাষার অনেক দৈন্য আছে। যে সব সূক্ষ্মানুভূতি, ভাবাবেগ, তথ্য ও তত্ত্বসম্ভার আমরা অনবরতই পাচ্ছি পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে তা মুখ ফুটে বলবার সামর্থ্যে কুলোয় না, এই দীন মাতৃভাষার বাক্যবিরল দরিদ্রভাণ্ডার থেকে শব্দ সংগ্রহ ক'রে। আমরা নিষ্কর্মা জাত। তাই বোধ করি আমাদের ক্রিয়াপদগুলির দৈন্য সব চেয়ে বেশী। মধুসূদনের সূক্ষ্মদৃষ্টি তা অনায়াসেই আবিষ্কার করেছিল। তাঁর অপূর্ব প্রতিভার ধারে যে গাঁঠ কাট্‌তে পারেন নি, তা কেটেছেন ভারে। কিন্তু সে মাইকেলি নামধাতুঘটিত ক্রিয়াপদগুলি কবিতায় চলিষ্ণু হ'লেও গদ্যে রইল অচল। তবু আন্তরিক উপলব্ধিগত সত্য অভিজ্ঞ শিল্পীর হাতে যেমন ক'রেই হোক আত্মপ্রকাশ করে এবং জোরের সঙ্গেই করতে

পারে, এ পরিচয় পেলাম আমরা প্রমথবাবুর লেখায়। তাঁর এই দান সামান্য দান নয়। এ দান যে তাঁর লেখনীর আয়ত্তাধীন হ'ল অবলীলাক্রমে তার প্রধান কারণ মনে হয়, তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে ছিল না কিছু অস্পষ্ট, তা স্বদেশেরই হোক আর বিদেশেরই হোক। ভাব ও চিন্তা যেখানে স্বচ্ছ ও অনাবিল, সেখানে ভাষা হয় প্রাঞ্জল ও বাহুল্যবর্জিত। বিদগ্ধ দৃষ্টির একটি লক্ষণ, লঘু কৌতুকের ছলে গভীর সত্যের সংক্ষিপ্ত কটাক্ষপাত। এই দামিনীদীপ্তি মুহুর্মুহু বিস্ফুরিত হয় বীরবলের চল্‌তি কলমে। অনেক কথা ব'লে কিছু না বলার মৌখর্য তখনি লেখক বা বক্তাকে পেয়ে বসে, যখন বক্তব্যের ঘরে শূন্য, কিন্তু বিবক্ষা নিরঙ্কুশ।

রণজিৎ সিংএর ক্রিকেট খেলা দেখেছিলুম একবার কলকাতার ইডেন গার্ডেনে। পটাপট 'বাউণ্ডারি' ক'রে চলেছেন অনাড়ম্বর ব্যাট্ চালনায়। কব্জির জোরে ঈষচ্চালিত ব্যাট বলটাকে যেমন ইচ্ছে যে দিকে খুসী দিচ্চে ঘুরিয়ে। এইরকম বল-চালনা দেখেছিলাম বীরবলী চালে। প্রমথনাথের রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক টিপ্পনীগুলি মোক্ষম্।

লেখার ভিতর দিয়ে লেখক আপনাকে জনারণ্যে ছেড়ে দেন। তারা আত্মীয় কি অনাত্মীয়, বোদ্ধা কি বেরসিক এ কথাটা জানবার ইচ্ছা লেখকের পক্ষে স্বাভাবিক। এটা অহমিকা নয়, আত্মনিবেদনের স্বীকৃতি পাঁচজনের কাছে না পেলে সে ভাষণ অরণ্যে রোদন মাত্র। সংসারে দেখেছি

মরমী লোকেরা যেমন মুখচোরা, নিন্দুকরা আবার তেমনি পঞ্চমুখ। উৎসবের দিনে 'মূকঃ করোতি বাচালং' তাই আজ অসঙ্কোচেই প্রমথ-প্রশস্তির আনন্দধ্বনিতে মুক্তকণ্ঠে যোগদান করছি।

রস-সাহিত্যের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞের বিচার বরণীয় হলেও বাজে লোকের মতামত নিতান্ত ফেল্‌না নয় এইজন্যে যে, তাতে লেখকের প্রভাবের চক্রবাল কতদূর বিস্তৃত তার একটা প্রমাণ পাওয়া যায়। দলাদলি রেষারেষি যেখানে সহজ সত্যটাকে মিথ্যার ধামা চাপা দিয়ে হত্যা করতে চায় সেখানে গাঁয়ের পঞ্চভদ্রান সাহিত্যিক উর্দি চাপ্‌রাশ্‌ না থাকলেও যদি ছুটে আসে সাধুবাদ উচ্চারণ করতে করতে, তবে কতকটা পুলিশের কর্তব্য সাধিত হয়।

'রূপ ও রীতি'র সম্পাদনার ভার নিয়ে ভূতপূর্ব 'সবুজ পত্রে'র সম্পাদক-মহাশয় তাঁর চিরনবীন হৃদয়ের দানসত্রটি আবার উন্মুক্ত করেছেন। তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানিয়ে এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যটি শেষ করি। আমাদের প্রত্যেকের প্রীতির অভিষেক তাঁর জীবন-প্রদীপটিকে স্বাস্থ্যে আনন্দে ও নবপ্রবর্তনায় কানায় কানায় ভরে তুলুক, সর্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা করি।